'আজ ও আগামীকাল' সিরিজ—

শিল্প-দর্শনের ভূমিকা

শিল্প-দর্শনের ভূমিকা

শুভেন্দু ঘোষ

'আজ ও আগামীকাল' সিরিজ
সমবায় পাবলিসার্স
কলিকাতা

আমার 'ছোট্ট মা-মণি'র

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুখবন্ধ

পুস্তিকাখানি, নামকরণেই প্রকাশ, শিল্প-দর্শনের ভূমিকা-মাত্র, এ বিষয়ের বিষদ্ বিস্তারিত আলোচনা নয়। এটি প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগানো, যাতে আমরা শিল্পজীবনে নিঃশংসয় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারি।

এই পুস্তিকায় যে প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একই ভাবধারা প্রবাহিত হলেও মাঝে মাঝে পারিভাষিক অসামঞ্জস্য চোখে পড়া অসম্ভব নয়। কোনো প্রবন্ধই মনের মত ক'রে সুসন্নিবদ্ধ করতে পারিনি; তবু কোনো প্রবন্ধেই আমি সজাগভাবে ফাঁকি দিতে চাইনি। ফ্যাসানের হুমকিতে কোথাও যে আত্মপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইনি, এ কথাও অবশ্য জোর ক'রে বলতে পারি না; তবু নিজে যা বুঝেছি, চিন্তার ধারার মধ্যে যা পেয়েছি, যা 'স্বী'কার করতে পেরেছি, তাই সাধ্যমত প্রকাশ করেছি। কোনো বিশিষ্ট মতবাদের সঙ্গে এগুলোকে খাপ্ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি বিশ্বাস করি সত্যে পৌঁছুবার জন্যে ভুল করার দুঃসাহসেরই প্রয়োজন।

—শুভেন্দু ঘোষ

সূচি

23. 4. 42

শিল্পের প্রেরণা

প্রথম প্রস্তাব

আমাদের প্রবন্ধের নাম দেওয়া হ'ল শিল্পের প্রেরণা; তবু এ আলোচনার উদ্দেশ্য শুধু রসের নয়, চেতনার যাবতীয় স্ফূর্তিরও, নিগূঢ় রহস্যটির সন্ধান। শিল্পের প্রেরণা আর বৈজ্ঞানিক প্রেরণা, এ দু'টির উৎসমূল বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। দুই-ই অখণ্ড সামাজিক জীবনের প্রকাশ; ভেদ যা, তা ঐ প্রকাশের ধারায়।

প্রকৃতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া নিয়ে মানুষের জীবন। প্রকৃতির কাছে মানুষ পেয়েছে তার প্রাণধারণের উপযোগী প্রাথমিক শক্তি; সেই শক্তিকে প্রকৃতির উপর প্রয়োগ ক'রে, মানুষ তাকে প্রচুরভাবে বাড়িয়ে চলেছে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ চলেছে প্রকৃতির রূপ বদলিয়ে; শুধু বহিঃপ্রকৃতির নয়, নিজের অন্তঃপ্রকৃতিরও। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এই যে শ্রমের গ্রন্থি—তারই মধ্যে আমরা পাই মানবের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের মূল সূত্র।

মানুষ যতদিন জীবনধারণের জন্যে প্রকৃতির খুসীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করত, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার, তার

কাছ হতে সহায়তা আদায় করবার কোনো প্রকাব কৌশল যতদিন তার অনায়ত্ত ছিল, ততদিন ছিল মানুষের পশুস্তব। এই স্তর মানুষ উত্তীর্ণ হ'ল সেদিন, যেদিন সে বচনা করল তার প্রথম হাতিয়ার, যেদিন সে শিখল শ্রমকে লঘু করতে। মানুষকে 'tool-making animal' বলাব ঐতিহাসিক সার্থকতা এইখানে। মানুষের শ্রম-সংক্রান্ত হাতিয়ার দেখে ইতিহাস-রচনা প্রণালীর যুক্তি-যুক্ততাও এইখানে।

মানুষ যেদিন হাতিযাব ব্যবহার কবা শিখল, সেদিন সে প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় ও সচেতন সম্বন্ধে এল, সেদিন মানুষ নিজেকে প্রকৃতিব সহযোগী 'স্রষ্টা' ব'লে প্রথম অনুভব কবল, আব সেদিন হতে আরম্ভ হ'ল মানুষ হিসাবে মানুষের ইতিহাস। সেদিন হতে তার বিচাববোধেব, তাব সংস্কৃতিরও সূচনা হ'ল।

কোনো বস্তুর গুণেব ধাবণা করতে হলে, তাকে তার পরিবেশেব মধ্যে তাব বিভিন্ন ও বিচিত্র সম্পর্কে দেখতে হয়। গুণ বোঝাতে, চাই বিশেষণ, বিশেষণেব জন্যে চাই বস্তুকে বিচিত্র সম্পর্কে আনয়ন। ইন্ধনের সম্বন্ধে এসে আগুন হয় দাহক, সোনাব সম্বন্ধে এসে হয় দ্রাবক ও পাবক, আবাব অন্ধকারে এসে, হয়ে যায় দীপক।

শুধু বিচিত্র সম্পর্ক দেখেই কিন্তু বাস্তবজ্ঞান পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতাব পাশে অভিজ্ঞতা সাজিয়ে, বাস্তবেব জ্ঞান গড়ে

ওঠে না; ওঠা সম্ভবও নয়। জীবনের—অর্থাৎ কাজের—ছন্দের মধ্যে গ্রথিত হয়ে এলে, অভিজ্ঞতা ঠিকমত রূপ পায়, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি, কাজকে সহজ ও সাবলীল করে তার ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশক্তির অপব্যয় ঘটে না; মানুষও তার মধ্যে সমাহিত হয়ে, নিজেকে, নিজের শক্তিকে, তার সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করতে পারে। ছন্দের ধর্মই হ'ল শক্তিকে সংযত, সংহত, একাগ্র ক'রে তোলা। এই জন্যেই পূর্বে, মানুষ যখন পশুস্তরে ছিল তখন, যে-কাজ ছিল বাঁচবার অন্ধ আবেগের প্রকাশমাত্র, সমবেত মানুষের কাজের ছন্দে প'ড়ে তা ক্রমে চেতনার বস্তু হয়ে ওঠে—তার উদ্দেশ্য, তার উপকরণ ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—'ধারণার' জন্ম হয়। এইভাবেই অভিজ্ঞতা সত্যের কোঠায় গিয়ে ওঠে; ভাষা ফোটে; বিচার-শক্তির উদ্বোধন হয়। আমাদের আদিম পূর্ব পুরুষদের একলক্ষ্য সমবেত শ্রম থেকে এসেছে আমাদের প্রথম ভাষা, আমাদের বিচার-শক্তি। এখানে আমরা 'সমবেত' শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। ভাষা ও বিচার-বুদ্ধি যে সামাজিক চেতনা হতে উদ্ভূত, এ-কথাটা সহজ হলেও আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হয়ে যাই। 'একক' মানুষের ভাষার প্রয়োজন হতে পারে না, কাজেই ভাষা থাকতে পারে না; আর ভাষা না থাকলে মানবীয় বিচার-বুদ্ধির উন্মেষের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

শিল্প-দর্শনের ভূমিকা

ব্যক্তিচেতনা সর্বক্ষেত্রেই সংস্কৃতির বাহন মাত্র, (বিভিন্ন স্তরের) সামাজিক উপলব্ধি তার উৎপত্তিস্থান; এবং এই সামাজিক উপলব্ধির অনন্ত উৎস মানুষের সামাজিক জীবনের মধ্যে—অর্থাৎ সামাজিক জীবন যে উৎপাদন-রীতির উপর গড়ে ওঠে, তার মধ্যে।

কাজের মধ্যে দিয়ে হয় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ স্থাপন—অন্তরঙ্গ পরিচয়; শুধু বহিঃপ্রকৃতির—ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদির সঙ্গে নয়, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিরও—ভাবের, আবেগের, ইচ্ছার সঙ্গে; মানুষের অন্তর্নিহিত সকল শক্তিরও সঙ্গে। কাজের মধ্যে মানুষ চেনে তার পরিপার্শ্বকে, পবিপার্শ্বে মানুষ চেনে নিজেকে।

প্রকৃতির সঙ্গে একযোগে 'স্রষ্টা' হওয়ার অনুভূতি নানাভাবে রূপায়িত হয়ে, হয় শিল্প। আবাব এই অনুভূতিকে নিছক বুদ্ধির স্তবে টেনে এনে, জীবনকে উপলব্ধি করা ছেড়ে বুঝতে চেয়ে, উপলব্ধির-ব্যাপকতায়-অধিগত ছন্দকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, অখণ্ডকে বিশ্লেষণের দ্বারা সুস্পষ্ট করতে গিয়ে জীবনের প্রয়োজন মত তাকে খণ্ডিত ক'রে, গ'ড়ে ওঠে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান সাধারণভাবে যতই বিশ্লেষণাত্মক হোক না কেন, যুক্তি-বিচারের উপর তাকে যতই নির্ভর করতে হোক না কেন, যখনই বিজ্ঞানকে নূতন একটা পথ কাটতে হয়েছে, বিজ্ঞানে যখনই কিছু বৈপ্লবিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তখনই দেখেছি

বৈজ্ঞানিকের খণ্ডিত জ্ঞান আবার জীবনের সমগ্র উপলব্ধির মধ্যে অলক্ষিতে কখন প্রক্ষিপ্ত হয়ে, জারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

শিল্প সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে, সবই পরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। বিজ্ঞান সম্পর্কিত উক্তিটা এখানে একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ইংরাজ সমাজে ধনতান্ত্রিক জীবনের সুস্পষ্ট বিবর্ত্তনশীলতার আওতায়, সেই জীবনের মূল ছন্দটা ধ'রে গড়ে উঠেছিল ডার্উনের বিবর্তনবাদ ; নইলে শুধু যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর ক'রে, সকল তথ্যের সন্ধান পেয়েও বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। [এখানে 'মূল্য' প্রসঙ্গে এ্যারিষ্টটল সম্বন্ধে মার্ক্সের একটা উক্তি মনে পড়ছে :— "অ্যারিষ্টটলের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাচ্ছি তাঁর এ-আবিষ্কারে যে, মালের মূল্য-রূপের নীচে রয়েছে একটা সমতার সম্পর্ক বা সার-গত সমভাব ; তিনি যে-সমাজে বাস করতেন সে-সমাজের ঐতিহাসিক সঙ্কীর্ণতার দরুণই তিনি এই সমতার সম্পর্কের সত্যিকার প্রকৃতিটা ধরতে পারেন নি।" (ক্যাপিটাল—প্রথম খণ্ড।)]

বস্তুতঃ, বিভিন্ন স্তরের সামাজিক-চেতনার বাইরের কোনো জিনিষ নিয়ে চিন্তা করা, যত অসাধারণই হোক কোনও মনীষার পক্ষেই সম্ভব নয়।

এতক্ষণ আমরা যা ইঙ্গিত করতে চেয়েছি, তা হচ্ছে এই যে, দার্শনিকরা সুকুমার শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎসমূলে যে

intuition বা প্রজ্ঞার কথা বলেন, সেটা এই সামাজিক উপলব্ধি মাত্র। প্রজ্ঞাব অন্তিম ভিত্তি সামাজিক জীবন, প্রকৃতিব সঙ্গে মানুষেব দ্বন্দ্ব (যুগপৎ মিলন ও বিরোধ,)— সমাজের বাস্তব উৎপাদন ব্যবস্থা।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বর্তমান শ্রেণীসমাজে, এক শ্রেণীর উপলব্ধি অন্য শ্রেণীব থেকে কতকটা বিভিন্ন; তাই ব'লে সামাজিক উপলব্ধিকে intuition-এর মত অস্পষ্ট, দুর্নির্ণেয় বস্তু মনে কববাব কোনও কাবণ নাই।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে ভেদ, সেটা গভীবতম বা বিশুদ্ধ উপলব্ধিব ক্ষেত্রে নয, প্রাকৃত উপলব্ধিব ক্ষেত্রে নয,—বিচাবের বা বিচার-পুষ্ট উপলব্ধিব ক্ষেত্রে। হৃদয়েব সহজ উপলব্ধিব বা আবেগেব স্তরে মানুষ, মানুষ ;—শ্রেণীগত জীব নয। সমাজেব স্বার্থ বিচার যখন এই উপলব্ধিতে অনুপ্রবিষ্ট হয, তখনই উপলব্ধিব প্রাকৃতিক বিশুদ্ধতা নষ্ট হয, তাতে শ্রেণী-বঙ ধবে।

বাস্তবিকই, সামাজিক উপলব্ধিকে abstraction মাত্র ধরবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। সামাজিক উপলব্ধিব চরম ভিত্তিব, সমাজের উৎপাদনশক্তি ও ব্যবস্থাব উপর নজর রেখে, সামাজিক উপলব্ধিব একটা আদর্শ রূপ কল্পনা কবা সর্বথা সম্ভব। উৎপাদন-রীতির বাস্তব প্রয়োজন যে-উপলব্ধি দ্বারা সমর্থিত বা পুষ্ট হওয়া সম্ভব, সেইটাকেও সামাজিক উপলব্ধি বলা যেতে পারে।

শিল্পের প্রেরণা

উৎপাদন ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান অনুযায়ী তাদের শ্রেণীচিন্তাপুষ্ট উপলব্ধির বৈষম্য ঘটে বটে, কিন্তু সেটা বাহ্য। নিগূঢ় উপলব্ধির ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংস্থানের কোনও প্রভাব আছে ব'লে মনে হয় না।

এখানে আমি প্রতিপাদন কবতে চেযেছি, শিল্প—মানুষের সামাজিক শ্রম-জীবন হতে উৎসাবিত, শিল্পের মূল চিরদিনই সামাজিক শ্রমে। প্রকৃতি ও মানুষের দ্বন্দ্বে মানবচিত্তে যে রস সঞ্জাত হয যে রসেব দ্বাবা খণ্ড জ্ঞানগুলি জারিত হয়ে সত্য হযে ওঠে, তারই প্রকাশ হচ্ছে শিল্প। সুতরাং, শিল্পকে জীবনেরই একটা প্রকাশ বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ, এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সু হোক, কু হোক, মানুষের বৃত্তি মাত্রই জীবন-চালনার প্রয়োজনে জন্ম নেয়। রস মানুষের গভীর চিত্তেব একটা বৃত্তি। সুতরাং শিল্পকে কোনো মতে নিষ্প্রয়োজন বলা চলে না। সামাজিক জীবন-চালনার প্রয়োজনেই শিল্পের জন্ম।

শিল্পের প্রেরণা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

মানুষ শুধু ব্যক্তি নয়; সে সমাজ এবং প্রকৃতির অংশ। মানুষ সামাজিক জীব ব'লে, সমাজের শরীরে যে-কোনো স্পন্দন তাকেও স্পর্শ না ক'রে যায় না। মানুষ প্রাকৃতিক জীব ব'লে প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা-বোধ সম্ভব হয়। একটা বিশেষ 'সমাজ'-ব্যবস্থায় 'প্রকৃতির' সঙ্গে দ্বন্দ্ব চালানই তো জীবন।

শিল্প মানুষেব প্রসারতার পবিচায়ক, তার আত্মপ্রসাবের পরিপোষক। শিল্পে মানুষ নিজেব বিরাটত্ব—তার সামাজিক এবং প্রাকৃতিক সত্তাকে উপলব্ধি করে। শিল্পের সর্বোত্তম সার্থকতা মানুষকে তার এই স্বকীয় অসীমতার মধ্যে মুক্তি দিয়ে।

আমরা বলছি, শিল্পে মানুষ তার নিজের পরিচয় পায়—নিজের বিরাটত্বের। শিল্পের সৌন্দর্য এইখানে, তার আনন্দের উৎসও এইখানে। শিল্প চিনিয়ে দেয়, কিন্তু একেবারে অপরিচিত কিছুকে নয়। 'জীবনে যা চিরদিন রয়ে গেছে আভাষে', তাকেই শিল্প চেনায়। শিল্পের সৃষ্টি, তাই, যা

ছিলনা তাকে গড়া নয়, যা আছে তার উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে নেওয়া। শিল্প মাত্রই Revelation—আবির্ভূতি, উদ্‌ঘাটন। আমরা অবশ্য এখানে সত্যকার শিল্পের কথা বলছি, যার ভিত্তি প্রাণের আবেগে,—কল্পনার বিলাসে নয়।

শেলী পশ্চিমে হাওয়াকে উদ্দেশ ক'রে গেয়েছেন: "Make me thy lyre even as the forest is"—'বনের মত আমাকেও তোমার বীণা ক'রে নাও।' মানুষ চায় প্রকৃতির বীণা হয়ে বাজতে—সমাজের বীণা হয়ে বাজতে; কারণ এইভাবেই সে তার পূর্ণতার আস্বাদ পায়। সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গতি স্থাপনই পূর্ণতা।

কথাটা অন্যভাবে বোঝা যাক। জীবনদ্বন্দ্বে সঙ্কুচিত মানুষের সাধারণ উপলব্ধি মোটামুটি ব্যক্তিগত; কিন্তু এই উপলব্ধি যত ব্যাপকতা ও গভীরতা পায়, যত নিজেকে প্রসারিত করতে পারে, ততই তার রূপ সামাজিক এমন কি প্রাকৃতিক (Elemental) হয়ে ওঠে। মানুষের চিত্তলোক হচ্ছে পেঁয়াজের মত। ঠিক তাও নয়, চিত্তের স্তর আমাদের বোধ-সৌকর্যের জন্য কল্পিত মাত্র। পেঁয়াজের উপরকার খোসা পেঁয়াজের আসল সত্তা নয়। একেবারে কেন্দ্রস্থলে থাকে পেঁয়াজের বীজ। ওই বীজের সজীবতাই পেঁয়াজের সজীবতা। মানুষের সাধারণ উপলব্ধি—নিত্যদিনের উপলব্ধিটা বাহ্যিক। তার অন্তঃস্থলে যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপলব্ধি, তার

পুষ্টিতেই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ পুষ্টি। শিল্পে মানুষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তার পরিচয়।

প্রথম প্রস্তাবে বলেছি, শিল্প ও বিজ্ঞান উভয়েরই উৎসমূল সামাজিক উপলব্ধিতে। এখন, শিল্পের বা বিজ্ঞানের প্রেরণার আবির্ভাব-রহস্য কী, সন্ধান করা যাক। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা মনের দু'টি স্তরের কথা ব'লে থাকেন—চেতন ও অবচেতন। এ-দুই স্তরের মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার কারবার চলে; চেতন মনের ভাবনা কখন অবচেতনে তলিয়ে যায়; অবচেতনের ভাবনা কখন-বা চেতনায় ভেসে ওঠে। আনমনা মানুষ ভাবে, কিন্তু কী ভাবে, জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না। লোকের ধারণা, সেগুলো যত বাজে ভাবনা; অকেজো ভাবনা। কিন্তু ঐ অবচেতন মনের ভাবনা সত্যিই অকেজো নয়। শিল্পীর বা বৈজ্ঞানিকের সব চেয়ে কার্যকরী ভাবনা ওই অকেজো অবচেতন মন থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে। ধ্যানীর ধ্যানে আর আনমনার উড়ো ভাবনার মধ্যে যে পার্থক্য তা হচ্ছে ধ্যানীর তীব্রতাজাত একাগ্রতায়,—শৃঙ্খলায়।

মানুষ জীবনে দেখে অনেক কিছু, শোনে অনেক কিছু, বোধ করে, ভোগ করে অনেক কিছু; কিন্তু লক্ষ্য করে খুব কমই, চেতনায় তুলে নেয় খুব কমই। কিন্তু যা চেতনায় তোলেনা, সেগুলো একেবারে হারিয়ে যায় না। ভুলে-যাওয়াদের সঙ্গে আধ-দেখারাও অবচেতন মনে স্থান পায়।

এইজন্যে আনমনে পথ চলতে হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় অনেক দিনের বিস্মৃত কথা। আনমনে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভেসে ওঠে একটা প্রশ্নের অসমাপ্ত উত্তরের বাকীটুকু। এই জন্যেই ধর্না দিলে স্বপ্নে ওষুধ মেলে—দৈব নয়, অবচেতন মনের অভিজ্ঞতা দত্ত। এসব ঘটে, তার কারণ অবচেতন মন কোনো একটা ছুতো পেলে বিস্মৃতকে সচেতন মনে ঠেলে দেয়।

জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই—(অভিজ্ঞতার সমগ্রতা নিয়ে হ'ল মানুষের ব্যক্তিত্ব) — মগ্ন চৈতন্যে অর্থাৎ অবচেতন মনে থাকে। এই সমগ্র অভিজ্ঞতার উপাদান কী কী? মানুষের biological অভিজ্ঞতা, যে-সমাজের ক্রম-বিকাশের মধ্যে পুরুষক্রমে মানুষ এগিয়ে এসেছে, সেই সব সমাজের অভিজ্ঞতা, মানুষ নিজে যে-সমাজে বাস করছে, তার অভিজ্ঞতা,—সমস্তই মগ্ন চৈতন্যের আশ্রিত। মনোবিকলনবিদ্‌রা বলেন, মগ্ন চৈতন্যের ভাবচিন্তা বহিঃচৈতন্য অর্থাৎ নিত্যদিনের-ঘা-খাওয়া, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত এবং সদাসশঙ্ক একান্ত ব্যক্তিগত মনটা ঘুমিয়ে পড়লে, স্বপ্ন হয়ে ওঠে। দিবাস্বপ্ন বা সহজে উৎসারিত কবিকল্পনাও স্বপ্ন ; বহিঃচৈতন্যকে ফাঁকি দিয়ে মগ্ন চৈতন্যের উঁকিঝুঁকি। মধুর দৃশ্য দেখে, মধুর শব্দ শুনে, কালিদাসের যে মনে হয়েছিল, এসব যেন কোন জন্মান্তরের স্মৃতি, সেটা অলীক নয় ; কালিদাস

কাব্যিকতা করেননি, সত্যই বলেছেন।—সকল তীব্র অনুভূতির মধ্যেই সত্যের প্রকাশ হয়ে থাকে।

যা বলছিলাম, জীবনের প্রায় পনেরো আনা অভিজ্ঞতাই থাকে মগ্ন চৈতন্যে; মানুষের প্রাকৃতিক বা সামাজিক উপলব্ধির প্রায় সবটুকুই থাকে মগ্ন চৈতন্যে। এই জন্যেই মগ্ন চৈতন্যের জিনিষ যখন জাগ্রৎ চৈতন্যেব মধ্যে এসে, পরিচিত রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে আমরা চিনতে পারি, কিন্তু শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে চিনতে পারি। সেই জন্যেই প্রকৃষ্ট শিল্পের আবেদন প্রধানতঃ সত্তার কাছে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রেরণা আসে সামাজিক উপলব্ধি হতে। মানুষ তার সমস্ত সত্তার উপলব্ধিকে যে-কোনো বাহ্যিক রূপে, স্বতোৎসারিত ছন্দে প্রকাশ কবতে পারলে, হয় শিল্প, বিশ্লেষণ করতে পারলে, হয় বিজ্ঞান।

সত্য ও অসত্য

[এই প্রবন্ধে আমি প্রতিপাদন করতে চেয়েছি :

১। সত্য হচ্ছে মানুষ কর্তৃক সৎ-এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্বীকৃতি।

২। সব সত্যই মানবিক সত্য—মানব জীবনের প্রয়োজন-জাত, তার বাস্তবতা হতে উদ্ভূত, সুতরাং সীমিত ও ক্রমবিকাশশীল।

৩। সৎ (যা কিছু আছে)-এর সমগ্রতায় হচ্ছে 'অন্তিম বা পূর্ণ সত্য'। এই পূর্ণ সত্য অজ্ঞেয়, কারণ সত্যের এই পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে সর্বদ্বন্দ্বের, সুতরাং জীবনের গতিরও বিরতি।

৪। সত্য আপেক্ষিক বলেই জীবনের গতি আছে। আপাতদৃষ্টির পূর্ণ সত্য গগন-সীমার মত অগম্য।

৫। শিল্পসৃষ্টি হচ্ছে 'সত্য'-সৃষ্টি]

রবীন্দ্রনাথ বেপরোয়া শুনিয়ে দিয়েছেন, "ঘটে যা, তা সত্য নয়।" তার চেয়ে নাকি কবিকল্পনাও সত্য। কিন্তু আমাদেব ষোলো আনা আস্থাই যা ঘটে, তারই উপর; কবিকল্পনাকে নেহাৎ করুণা ক'রে সয়ে যাই মাত্র।

বস্তুতঃ ঘটে যা, তাই সত্য; শুধু তার সাধারণ প্রতিবেদনকে নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ সাক্ষ্যই সত্য-বিচারে

শেষ কথা নয়; সমগ্র সত্তার স্বীকৃতি প্রয়োজন। কবির বক্তব্য এই।

সত্য জীবন-নিরপেক্ষ নয়; সত্য মানব-নিরপেক্ষ নয়; বরং তার আগাগোড়াই মানবিক। মানুষের বোধের (awareness) বহির্ভূত কোনো কিছু, তার অস্তিত্ব থাকলেও, মানুষের কাছে তা সত্য নয়। মানুষের এই বোধই তার জীবন-চালনার অবলম্বন। এই বোধের সঙ্গে যা গ্রথিত হতে পারে, তাই মানুষের কাছে 'সৎ'। বোধে গ্রথিত হলে 'সৎ' সক্রিয় হয়ে ওঠে, মানুষের জীবনের উপর ক্রিয়া করে,—সত্য হয়। এই অর্থে, তথ্য মাত্র স্বয়ং-সত্য নয়; তত্ত্বের, ব্যাপক বোধের, পটভূমিকায় ধরা প'ড়ে, তার অঙ্গীভূত হয়ে, তবে তা সত্য হয়ে ওঠে। তত্ত্বই জীবন-সহায়ক, জীবনের পক্ষে তাপ ও আলোক দাতা অগ্নি, তথ্য তার ইন্ধন মাত্র। তথ্যে প্রাণ সঞ্চার হলে, তত্ত্বরূপে তা প্রকাশ পেলে, তা সার্থক হয়ে ওঠে।

এখানে সৎ-কে মনের সৃষ্টি বলা হচ্ছে না; মানুষের বোধাতীত কিছু থাকলে, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করাও হচ্ছে না; বলা হচ্ছে, মানুষের জীবনকে যা স্পর্শ করে, মানুষ তাকে বোধ না ক'রেই পারে না, মানুষের কাছে তার বোধাতীত কিছু সত্য নয়, কারণ তা জীবনকে স্পর্শ করে না।

দেখা গেল, সত্য মানব-বোধের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু একথাও আমরা জানি যে, একই জিনিষ সকল মানুষের কাছে

একভাবে প্রতিভাত হয় না। 'বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। তার কারণ অবশ্য এই যে, সব মানুষ, ঘটে যা তাকে, একভাবে দেখে না ; নিজ নিজ স্মৃতি ও সংস্কার অনুযায়ী, নিজ প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে, অর্থাৎ নিজের প্রাণের মত ক'রে, নিজের ব্যাপক বোধের, তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে গ্রহণ করে। এই কারণে, একই সত্য বিভিন্ন মানুষের জীবনে বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, তাকে বিচিত্র ক্রিয়া করতে দেখা যায়।

তাহলে সৎ-এর কোন্ রূপটা ঠিক? সৎ-এর কোন্ রূপটাকে, তাহলে, সত্য বলি? সব মানুষই সৎ-এর সেই রূপটাকে ঠিক বলবে, যা তার কাছে ধরা পড়েছে ; তার নিজের বোধের অতীত কিছুকে কোনো মানুষই স্বীকার ক'রে নিতে পারে না। আমি এখানে জীবনে 'স্বী'কার—অঙ্গীকার—করার কথা বলছি।

পাচ্ছি, এক 'সৎ'ই 'বহু সৎ'-এর রূপে প্রতিভাত হতে পারে এবং তার সকল রূপই সত্য—অবশ্য, বিভিন্ন দর্শন-কোণ থেকে ও বিভিন্ন সীমার মধ্যে।

ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ছে, কিন্তু উপরের কথাগুলো একবার মেনে নিয়ে, আমাদের এইটুকু অন্ততঃ মানতেই হচ্ছে ; সত্যের সত্তা হচ্ছে প্রকাশে—ব্যাপক অর্থে, রূপায়ণে। যা আছে, তা 'সত্য' হয়, প্রকাশ পেলে, মানুষের জীবনের

মধ্যে প্রকাশ পেলে। স্ব-রূপে তা পূর্ণতা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেন দিক্‌চক্র :—

"একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

কথাটা অন্যভাবে বিচাব কবা যাক। প্রকৃতির নিয়ম চিরদিন একই আছে, অন্ততঃ এই কল্পনার উপর আমাদের সমস্ত জীবনযাত্রা চলেছে ;—কিন্তু মানুষের বোধে তা যুগে যুগে নূতন ও সমৃদ্ধতব রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতিব নিয়ম সত্য, আবাব তার প্রতি যুগেব মানুষের বোধে প্রতিভাত রূপও সেই যুগের জন্যে সত্য।

প্রকৃতির নিয়ম হ'ল শাশ্বত ; অন্ততঃ এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে মানুষকে সর্বদা চলতে হয়। প্রকৃতির নিযমের ব্যাখ্যা কিন্তু যুগগত। প্রতি উৎপাদন-স্তরে তার রূপান্তর ঘটে এসেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিজ্ঞানের সাধাবণ সত্যগুলো যুগের মানুষেব সাধারণ তত্ত্ববোধ দ্বারা সীমিত। কেপ্‌লার জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা যুগ-সীমিত সত্য আবিষ্কার করেছিলেন ; সে সত্যের পূর্ণ রূপ যখন প্রকাশ পেল, তার ভিত্তির উপর নূতন নূতন তথ্য যখন প্রকাশ হ'ল, তখন সেই নূতন তথ্যগুলোর সামঞ্জস্য ঘটাতে গিয়ে কেপ্‌লারীয় সত্য বাতিল হয়ে গিয়ে, এল নিউটনীয় সত্য। তাও একদিন

অমনি ভাবে বাতিল হয়ে গেল। তবু কেপ্‌লারীয় সত্য ও নিউটনীয় সত্য একদিন পরম সত্যই ছিল ; কারণ মানুষের জীবনে—বিজ্ঞানে—তারা নব নব উদ্ভাবনের পথ ক'বে দিয়েছিল। একথা মেনে নিলে, মানতে হয—সত্যের সত্তা প্রকাশে, মানবেব প্রযোজন মত 'সৎ'-এর মানব-বোধে প্রকাশে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে—বিজ্ঞানের ক্রমপরিণতিকে খণ্ডিত ক'বে দেখলে, কেপলার-নিউটনের তত্ত্ব অকেজো বা অসত্য, কিন্তু অখণ্ডরূপে দেখলে সেগুলো সত্য, কাবণ বর্তমানের সত্য সেগুলোবই স্ফুটতব রূপ মাত্র।

এ আলোচনা থেকে নূতন কথা পাচ্ছি : পরিজ্ঞাত সত্য, গণ্ডীব সত্য মাত্র। একটা গণ্ডীর বাইবে তা মিথ্যা। এই সত্য সর্বদা মানব-প্রযোজনেব অপেক্ষা বাখে, সত্য মাত্রই "প্রযোজনের সত্য"। আমবা যাকে মিথ্যা বলি, সে-সবও কোনো-না-কোনো প্রয়োজনেব গণ্ডীবদ্ধ সত্য।

যুক্তিজাল গুটিয়ে দেখি কী উঠল ? জীবনকে যা ফুটিয়ে নিযে চলে, মানুষের সত্তাকে যা প্রসারিত করে, সৎ-এর বিচিত্র রূপ হতে, "অসৎ হতে যা মানুষেব বোধকে সৎ-এর পূর্ণতাব অভিমুখীন কবে ; তমসা হতে জ্যোতিঃর অভিমুখীন কবে এবং মৃত্যু (খণ্ডিত) হতে যা অমৃতের (অখণ্ড রূপের), অভিমুখীন করে," তাই সত্য। জীবনকে যা সঙ্কুচিত করে, জীবনের বিকাশকে যা ব্যাহত কবে, সৎ-এর সমগ্রতা থেকে-

যা তার বিবিধ খণ্ডিত প্রকাশের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাই অসত্য। "He to whom all things are one, who draweth all things to one, and seeth all things in one, may enjoy true peace and rest of spirit"—

Via Pacis—Jeremy Taylor.

এই হিসাবেই, শিল্পের মায়াসৃষ্টি যদি সত্তাকে আনন্দের, অমৃতের, ফুটে-ওঠার বোধের দিকে নিয়ে যায়, তা সত্য। রসের সত্য, সত্যই। বাহ্য দৃষ্টিতে উদ্ভট, কিন্তু প্রাণশক্তিতে পূর্ণ শিল্পও আমাদিকে সাধারণ প্রাত্যহিক খণ্ডিত সত্যের অতীতে রসলোকের ব্যাপক সত্যে উত্তীর্ণ করে, তাই তা আমাদের কাছে সত্য ব'লে এত সবল স্বীকৃতি পায়। আবার কোনো বাস্তব ঘটনার, সাধারণ অর্থে যথাযথ, বিবরণও যদি মানুষকে সঙ্কুচিত করে, তা অসত্য। এ-কথা এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাস্তব-নিষ্ঠ শিল্পী গোর্কীও তাঁর "দিনপঞ্জীর টুকরো"-গ্রন্থে মেনে গিয়েছেন। মানুষের সত্তার সঙ্কোচে সত্যের সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী, 'সৎ'-এর সঙ্কীর্ণ রূপ প্রতিভাত হতে বাধ্য।

ঋষিকবির উক্তি দিয়ে এই স্পর্ধিত প্রবন্ধের আরম্ভ করেছি, তাঁর বাণী দিয়েই এর পরিসমাপ্তি হোক :—

"অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

শিল্পের স্বরূপ

"মানুষ সঙ্গে আয়না নিয়ে দুনিয়ায় আসে না, ফিক্টে-পন্থী দার্শনিকের মত বলতেও পারে না, 'আমি হচ্ছি আমি', নিজেকে তার চিনে নিতে হয় অন্যের মধ্যে নিজের প্রতিরূপ দেখে। 'পিটার' লোকটা মানুষ হিসাবে তার নিজের সঙ্গে সম্বন্ধটা বুঝে নেয়, তার সমজাতীয় সত্তা হিসাবে 'পল' লোকটার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ বিষয়ে সজাগ হয়ে। 'পল' তখন তার রক্তমাংস সত্বেও, তার 'পলীয়' দৈহিকতা সত্বেও, পিটারের কাছে মানুষ জাতটার প্রাতিভাসিক রূপ নিয়ে, phenomenal রূপ নিয়ে—দেখা দেয়।" (মার্ক্স, ক্যাপিটাল্, প্রথম পরিচ্ছেদের পাদটীকা।) পলকে দেখে পিটার নিজেকে পলের সমজাতীয় ব'লে চিনল, কিন্তু সমাজের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে সে কে, কেমন ক'রে জানবে?

মানুষকে তার প্রাকৃতিক—তার সামাজিক সত্তার পরিচয় নিতে হয়, প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে নিজেকে দেখে। প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে মানুষের মনে যে 'সজাগতা' জাত হয়, সেটা শুধু এগুলোর অস্তি-ভাব নয়, নিজেরও 'অস্তি-ভাব'। প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে

একাত্ম হয়ে, মানুষ বোঝে সে 'আছে'—তার নিজের বিবাট সত্তার উপলব্ধি পায়। মানুষ তার এই বিরাট 'হওয়া'র কথাটা ঘোষণা ক'রে যায় শিল্পে। উপলব্ধি স্বীকৃতি চায়, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না; মানুষ নিজের বিবাট সত্তার স্বীকৃতি রেখে যায শিল্পে। ইংবেজ কবি স্পেণ্ডাব এই উপলব্ধিকে বলছেন, "awareness deeper than consciousness"—'চৈতন্যেব চেযে গভীর একটা অস্তিবোধ', চৈতন্যেব বস্তু প্রমাণের অপেক্ষা রাখতে পাবে; চৈতন্যেব চেয়ে যা গভীব, তার সত্যতা স্থাপিত হয় প্রকাশ হয়েই। শিল্পের সার্থকতা মানুষকে নিজের কাছে প্রকাশ ক'রে।

'সৎ'-এব, যা কিছু আছে, সব কিছুব—ধর্মই হ'ল স্ফূর্তি, অবিরত হয়ে-চলা। আদিম প্রকৃতি ছিল এক, স্ফূর্তিব প্রযোজনে হ'ল দুই, (অবশ্য আমাদেব মানবীয় দৃষ্টিকোণ হতে,)—মানুষের প্রকৃতি ও মানুষেব বাইবের প্রকৃতি। মানবীয় চেতনাব উন্মেষ এর মূলে। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বে—মানুষেব মধ্যেকার ও প্রকৃতিব অন্তরস্থ সেই 'দুই-এ-এক শক্তি' নিজেকে রূপে রূপে ফুটিযে চলেছে। প্রকৃতিকে পরিবর্তন কবতে করতে, মানুষ নিজেকে পবিবর্তন ক'বে চলেছে। কিন্তু কোথায়? —সচেতন ভাবে স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে,—প্রকৃতিকে পূর্ণভাবে চিনে নিতে, সেই চেনাই তার নিজেকে চেনা। এঙ্গেল্‌স্ বলছেন, "Freedom is the recognition of necessity"

—প্রকৃতিকে জেনে প্রকৃতিকে জয় করা যায়, অন্তঃপ্রকৃতিকে শুধু নয়, বহিঃপ্রকৃতিকেও।

আদিতে মানুষ ছিল একক প্রকৃতিশক্তির একটা ধারা। আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতিব অন্ধ অঙ্গ। তাব নিম্নতব স্তর, পশু-অবস্থা সে ছাড়তে থাকল, চৈতন্যের বিকাশের সঙ্গে। মানুষ ও প্রকৃতিব সহযোগিতায় মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সভ্যতাব বিকাশের মধ্যেই তার অন্তিম পবিণতির পরিচয় নিহিত থাকবার কথা।

বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ 'মুলেব লাইয়াব' মানুষের যৌন জীবনের প্রগতির ইতিহাস আলোচনা ক'বে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে, "true culture lies not in stunting and suppressing but in guiding and ennobling the natural instincts," অর্থাৎ প্রাকৃতিক সহজ প্রবৃত্তিকে খর্ব কবা বা দাবানো নয়, পরিচালিত ও উন্নত কবাব মধ্যেই সত্যিকাব সংস্কৃতি। এ থেকে বোঝা যায়, মানব-সভ্যতার পবিণতি হচ্ছে, মানুষের পূর্ণচেতনভাবে প্রকৃতিস্থ হওয়ায়। মানুষেব পূর্ণতাব স্বপ্ন, তাব মুক্তির স্বপ্ন এ সকলেব মূলে তার সমগ্র সত্তাকে উপলব্ধি কবাব কামনা। নিজেকে বহুর মধ্যে, সবেব মধ্যে হাবিয়ে পাওয়াতেই মানুষেব সত্যিকার স্ফূর্তি— এই স্ফূর্তিব বেগেই মানব-সভ্যতা চলেছে। রুসোব প্রাকৃতিক মানুষেব স্বপ্ন অলীক ছিল না ; একটা বিবাট সমাজকে উদ্বুদ্ধ

করতে পারে যে ধারণা, সে-ধারণা মিথ্যা হতে পারে না; বস্তুর উপলব্ধিকে জাগ্রৎ করতে পারাটাই তার সত্যতার সব চেয়ে ভাল প্রমাণ। (রুসোর ভুল ছিল অতীত কালে সত্যযুগ সন্ধান করার প্রবৃত্তিজাত বিচারে।) মার্ক্স যে বলেছেন, "মানুষ এখনও তার প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম করেনি, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে এসে করবে," তার অর্থও বোধ হয় এই যে, মানবীয় চেতনা পাওয়ার পর হতে, মানুষ এ পর্যন্ত তার ক্রমবিকশিত চৈতন্য নিয়েও নিজের অখণ্ডিত সামাজিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি—সামাজিক শ্রেণীভেদের জন্যে, যখন পারবে, তখন চৈতন্যের পূর্ণতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সহজ হয়ে উঠবে। উপরের আলোচনা হতে আমরা পাচ্ছি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপলব্ধির প্রকাশক হিসাবে, শিল্প মানুষকে তার বর্তমানের সত্তাপ্রসারেই শুধু সহায়তা দেয় না, তার অন্তিম পরিণতির দিকে এগোবার শক্তিও বাড়িয়ে চলে।

শিল্প মানুষের আত্ম-পরিচায়ক, তার মুক্তি সাধনার একটা অখণ্ডনীয় অঙ্গ। শিল্পের এই হচ্ছে পরম রূপ।

শিল্পের আঙ্গিক

আমাদের দর্শন বলে "এক ছিল।" "একো সৎ।" —(মানুষের দৃষ্টিকোণী থেকে দেখলে) হ'ল দুই—সৎ আর চিৎ। আর এ দুই-এর দ্বন্দ্বে, যুগপৎ মিলন ও বিরহে, এল আনন্দ—এল রস। অখণ্ড প্রকৃতি মানুষের কাছে হ'ল দুই :— মানব-প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি ; আর এই দুই-এর দ্বন্দ্বে রসের জন্ম হ'ল। আমার বাইরের যা কিছু সব আমার কাছে বহিঃপ্রকৃতি, আমিও প্রকৃতির মধ্যে। আমার সঙ্গে এই বহিঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্ব সম্ভব হ'ল, আমার প্রাকৃত সত্তা—এবং এর সঙ্কীর্ণতর রূপ, সামাজিক সত্তা আছে ব'লে। সৎ আকর্ষণ করছে চিৎ-কে, চিৎ আকর্ষণ করছে সৎ-কে—অথচ নিঃশেষে পাচ্ছে না ব'লে "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" পাচ্ছে না ব'লেই, হিন্দু দর্শন বলে, সৃষ্টির কাজ চলছে—শিল্পের সৃষ্টি অন্ততঃ তার জন্যে যে চলছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। পাচ্ছে না ব'লেই, এক, বিচিত্র, বহু হয়ে উঠছে। এই বৈচিত্র্যের মূলে তাহলে ঐ রস—'বিষয়' 'বিষয়ীর' বিরহ-মিলন-লীলা।

শৈল্পিক উপলব্ধি প্রাকৃত সত্তার জিনিষ—সামাজিক সত্তার জিনিষ। সুতরাং অবচেতন মনে তার বাসা। শিল্পের রস যত গভীর, প্রাণ যত সতেজ, তার উৎস অবচেতন মনের তত

গভীর গুহায়। রস আদিতে অনঙ্গ—সৎ সম্বন্ধে একটা জাগর ভাব মাত্র,—এই রস যত মনের উপরের দিকে ঠেলে ওঠে, তত তাকে মনের অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরের বস্তু স্মৃতির এবং সংস্কারের সংস্পর্শে আসতে হয়, তত তার অঙ্গ গড়ে ওঠে। স্মৃতি ও সংস্কার উভয়ই জড়ধর্মী; রস তাদের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে চলে তাদের রঙে রঙীন হয়ে। উপলব্ধি হচ্ছে রসের বিকাশের একটা ঘনীভূত অবস্থা।

মনের বিভিন্ন স্তরে রসের অঙ্গ নেওয়ার উপাদান বিভিন্ন। যেমন, স্বপ্নের একটা স্তরে তার উপাদান হ'ল, যাকে মনো-বিকলনবিদ্‌রা বলেন archetype বা আদিরূপ, যেটা আমাদের পরিচিত প্রতিদিনের সাধারণ রূপের মত নয়। রস এই আদিরূপের সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করে খাঁটি উপকথায়, মিস্টিকদের রচনায়, ধর্ম-সাহিত্যে।

প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ সজাগতায় অভ্যাসের জড়তা বর্তমান। সজাগতা যত বেশী গভীর মনের, তত তার জড়তা কম, প্রাণের উচ্ছল গতি তত তাতে বেশী পরিস্ফুট। মানুষের উপলব্ধি যত প্রাকৃতিক ও সামাজিক সত্তা-গত, সেটা তত গভীর,—গভীর ও ব্যাপক। আমরা জানি, প্রাত্যহিক জীবনের সজাগতায় ব্যবহারিক জগতের বিধি-নিষেধ প্রবল, অভ্যস্ত ব্যবস্থা সেখানে প্রতিপদে সত্তার গতিকে প্রতিহত করে এবং সত্তাকে সঙ্কুচিত ক'রে দেয়। আমরা জানি, প্রতি

দিনের জগতের রীতি আমাদেব সহজ উপলব্ধিকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ কবে। আধুনিক মনোবিকলনবিদ্‌দের দৌলতে আমরা এও জানি যে, অবচেতন মনের যত গভীর স্তবে অবরোহণ করা যায়, এই সব সত্তা-সঙ্কোচক বিধিনিষেধ, এবং ব্যবহারিক জগতের রীতিনীতি তত অর্থহীন হয়ে পড়ে, জড়তা তত কমতে থাকে। বস্তুতঃ, মনের বিভিন্ন স্তরে বাস্তবকে দেখার ভঙ্গীই বিভিন্ন।

কোনো মনেব এক স্তরেব উপলব্ধি অন্য মনের ঐ স্তরে সংক্রামিত করে শিল্প। (অবশ্য, মনের মধ্যে কোনও প্রাচীর ঘেবা মহল বা স্তব নাই—বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে এটা কল্পিত হয়েছে।) এখন, আমবা প্রায সব সময়েই থাকি প্রাত্যহিক জীবনের সাধাবণ সজাগতার স্তরে। সুতবাং এইটা হ'ল উপলব্ধির সংক্রান্তির মধ্যম। তাহলে, উপলব্ধি এই মধ্যম পাব হয কেমন ক'বে ? ব্যবহারিক জগতেব বিধিনিষেধ, রীতি-নীতিব জড়তা এড়িয়ে, উপলব্ধি অক্ষতভাবে অন্যেব চিত্তে গিয়ে ওঠে কী ক'বে ? তার গতিধর্ম অব্যাহত বাখে কী করে ? প্রতিদিনেব মনকে প্রথমে যথাযোগ্য গভীরতায নামানো দরকাব, তাব পরে সংক্রামণ হতে পাবে। কম্পন সঞ্চাবণেব জন্যে বীণাব তাবগুলোকে একতানে বেঁধে নিতে হয়। (উপলব্ধিকে চিত্তবীণাব একটা বিশেষ বেগেব কম্পন কল্পনা করা যেতে পারে।)

রস শিল্পে কী ভাবে রূপায়িত হবে, সেটা নির্ণীত হয় শিল্পীর মনের স্মৃতি ও সংস্কার দ্বারা। এই স্মৃতি ও সংস্কার অতীত উপলব্ধির জড়রূপ মাত্র। নানা স্মৃতি, নানা সংস্কারের সংস্পর্শে এসে রস, তাদিকে গেঁথে নিয়ে, মিশিয়ে নিয়ে, নিজের অঙ্গ গড়ে নেয়। এই স্মৃতি-সংস্কার মানুষ কেবল তার স্বতন্ত্র জীবনে সঞ্চয় করে না, এগুলো শুধু তার ব্যক্তি সত্তার অভিজ্ঞতা জাত নয়—তার সামাজিক সত্তা, তার প্রাকৃতিক সত্তা সবেরই স্মৃতি ও সংস্কার আছে। সমগ্রসত্তা, সুতরাং মানুষের ব্যাপকতম সত্তা, যখন কোনও বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন সেই আসক্তির উপলব্ধি প্রাকৃতিক সত্তার স্মৃতি-সংস্কারের আশ্রয়ে ফুটে ওঠে। সামাজিক সত্তা নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করে সামাজিক সত্তার স্মৃতি ও সংস্কার দিয়ে। ব্যক্তিসত্তাও নিজের কথা জানাতে পারে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও সংস্কারের সহায়তায়।

রস, তাহলে, একান্তই স্বয়ম্ভূ, তার অঙ্গায়নও "নিয়তি-কৃত নিয়মরহিত।" শিল্পের 'রীতি', তার 'আঙ্গিক' নিয়ে সমস্ত আলোচনা কি তবে শুধু শিল্প বোঝবার জন্যে? শিল্প রচনায় কি তার কোনও সহায়তা নাই? আছে—নিশ্চয়ই আছে।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা এক একটা বিশেষ রসের সঙ্গে যখন এক একটা বিশেষ আঙ্গিকের সম্পর্ক নির্ণীত হয়ে যায়,

তখন সেই বস প্রকাশে সেই আঙ্গিকের প্রযোগ প্রকাশেব কাজটা সহজ ক'রে দেয়। শিল্পে আঙ্গিকের প্রয়োগের মানে হচ্ছে, বসের চবিত্র বুঝে, সে রসের প্রকাশে, তার প্রেয় সুপরিজ্ঞাত স্মৃতি-সংস্কৃতির প্রয়োগ। কোনো রসের প্রেয়, সুপবিজ্ঞাত স্মৃতি-সংস্কৃতি কোনোমতে গেঁথে তুললে, সেই রসের একটা ক্ষীণ আভাস স্বতঃই পাওয়া যায়। হিন্দু সঙ্গীতের শ্রেণীভেদ এই মোটা সত্যেবই উপব স্থাপিত হয়েছে। তাহলে পাচ্ছি, প্রতিদিনেব মনকে শিল্পেব যথাযোগ্য গভীরতায নামিয়ে আনাব প্রাথমিক কাজটা করে আঙ্গিক।

আজকাল, শিল্পেব আঙ্গিক নিয়ে নানা প্রকাব পবীক্ষা চলছে; অনেক সময়, এ পবীক্ষার সত্যিকাব উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে। এব ফলে, আঙ্গিকেব চাতুবীকে সত্যিকার শিল্প ব'লে চালাবার অপচেষ্টা হয়েছে। আমবা এতক্ষণ যা বলেছি, তার দ্বাবা ম্যাথিয়েসেনেব এ সম্বন্ধে একটা উক্তির যৌক্তিকতা বেশ বোঝা যাবে। তিনি বলছেন, শিল্পে কোনো বকম পরীক্ষারই মূল্য নাই, যদি-না সেটা চিত্ত-স্ফূর্তিব জন্যে প্রয়োজন হয়— Unless it is psychologically necessary,—"কোনো বড় নবোদ্ভাবক নূতন কিছু করাব জন্যে নূতনত্বেব সন্ধান করেন নি; ববং সেক্সপীয়বেব মত, একটা আভ্যন্তবীন প্রযোজনে এক পা, এক পা ক'রে নবোদ্ভাবনে চালিত হয়েছেন, তাঁর উপাদনই যেন তার উপবে ঐ আকারের নূতনত্ব চাপিয়ে

দিয়েছে; তিনি সেটাকে নিজে থেকে খুঁজতে যান নি।" সত্যিই, সাধারণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত আঙ্গিকের আদর্শেই রস ফুটবার চেষ্টা করে; যখন তেমনভাবে তার প্রকাশ সুষ্ঠু হয় না, তখনই সে নূতন রীতিতে, নূতন আঙ্গিকে নিজেকে ব্যক্ত করতে চায়। নূতন আঙ্গিক আসে রসে নূতনত্ব এলে। আর রসের নূতনত্ব আসে, বাস্তব জীবনের গতিতে, সমগ্র সত্তার উপলব্ধিতে যখন নূতনতা দেখা দেয়। অর্থাৎ, মানুষের ঔৎপাদনিক জীবনে গতিফের হলে, তার অন্তর্জীবনেও গতি-ফের হয়, রসের রূপান্তর ঘটায়, আর শিল্পে আঙ্গিকের সার্থক অভিনবত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

শিল্পে বিষয় ও বিষয়ী

শিল্পকে 'বিষয়-আত্ম' ও 'বিষয়ী-আত্ম' এই দুই ভাগে বিভক্ত কবার একটা বীতি পাশ্চাত্য শিল্প-দর্শনে চলিত আছে। এ রীতি অধুনা আমাদেব সমালোচনায়ও দেখা দিয়েছে। বিষয়-আত্ম শিল্পেব লক্ষণ বলা হয় এই যে, তাতে বহিঃপ্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা থাকে, শিল্পীব বিশিষ্ট দৃষ্টি-কোণ ফুটে ওঠে না, আব বিষয়ী-আত্ম শিল্প সম্বন্ধে বলা হয়, তাতে শিল্পীব দৃষ্টিকোণ —একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ—হতে বাস্তবেব উপলব্ধি ব্যক্ত হয়।

এই বিভাগের যৌক্তিকতা ভালভাবে বিচার কবার জন্যে শিল্পে বিষয়-বিষয়ীব সম্বন্ধটা বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিল্প মেকী কি খাঁটি ধববাব নিরিখ্ হচ্ছে, তার প্রাণধর্ম আছে কি না। শিল্পেব রূপ ও রস—দুটোই প্রাণধর্মের দান। এই প্রাণ শিল্প পায় কোথা হতে?

শিল্পেব বিষয় হ'ল যা কিছু আছে—শুধু বহিঃ-চৈতন্যের স্বীকৃতিতে নয়, সমগ্রসত্তাব স্বীকৃতিতে, সে সমস্ত—'সৎ'। এই সৎ-এব মধ্যে মানুষও পড়ে, কিন্তু এই সৎ-ই আবাব, মানুষেব আত্ম-কেন্দ্রিক দৃষ্টিতে, 'মানুষ' ও 'প্রকৃতি' এই দুই রূপে প্রতিভাত। মানুষ এখন আর শুধু 'সৎ' থাকছে না,

হচ্ছে 'চিৎ,' মানুষ এখন শুধু 'বিষয' থাকছে না, 'বিষয়ী'-ও হয়ে উঠছে। বিষযী হয়ে, মানুষ সমস্ত-'সৎ'-থেকে একটা পৃথক সত্তা পায়, বিষয়-রূপী নিজেব থেকেও।

মানুষেব জীবন হ'ল মানুষের প্রকৃতিব সঙ্গে দ্বন্দ্বে। 'চিৎ'-দ্বারাই সে প্রকৃতি থেকে বিশেষিত—'সৎ' থেকে এখানে বিভিন্ন। সুতবাং মানুষ এবং প্রকৃতিব এই দ্বন্দ্বেরই একটা রূপ হ'ল সৎ-চিতেব দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেব মধ্য দিযে মানুষ ক্রমাগত বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তন কবতে কবতে নিজেকে পবিবর্তন ক'বে চলেছে। মানুষ একদিন ছিল অন্ধ প্রকৃতির দ্বাবা পবিচালিত; মানুষ-প্রকৃতিব দ্বন্দ্বেব ফলে মানুষ চলেছে পূর্ণসচেতন ভাবে স্বাভাবিক হতে। মানুষের সভ্যতা হ'ল এই পুনঃস্বাভাবিক হওযাব পন্থা। শিল্প হ'ল, বিজ্ঞানেব মত, মানব-সভ্যতাব একটা দিক। সৎ ও চিৎ-এব, বিষয় ও বিষযীব দ্বন্দ্বেব সম্বন্ধ হতে বসেব উদ্ভব। এই বসই হচ্ছে শিল্পেব প্রাণবস্তু, বিজ্ঞানেবও। এই বসের স্বতঃ-উৎসারিত রূপ, সমগ্র সত্তাব ববণীয় রূপ হ'ল, শিল্প; বহিঃ-চেতনাব অধিগত রূপ—বুদ্ধি-গ্রাহ্য রূপ হ'ল, বিজ্ঞান। সে যাক। এখন আমবা আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসি।

বিষয-বিষয়ীব সহযোগিতায রসের জন্ম, আব শিল্পেব প্রাণ-বস্তুই হ'ল রস। সুতরাং শিল্পে বিষয় ও বিষযী দু'-এরই পরিচয় অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য।

তাহলে, 'বিষয়'-আত্ম ও 'বিষয়ী'-আত্ম শিল্পেব মধ্যে বিভেদ নিশ্চয়ই এ নয় যে, একটাতে বিষয়ই আছে, বিষয়ী নাই ; আরটাতে বিষয়ী আছে, বিষয় নাই। সেটা যে অসম্ভব। তা যদি হয়, ও-বিভেদ কি একেবারে নিবর্থক ? তাও নয়।

রসেব জন্ম 'চিৎ'-এব গর্ভে,—বস প্রকাশ কবে মানুষ। বিষয়ী (মানুষ) যখন পবিপূর্ণভাবে নিজেকে বিষয়ে অর্পণ কবে তখন সে আব বিষযী থাকে না, বিষয়েব সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয, বিষযও আব বিষয় থাকে না, বিষয়ীর সঙ্গে প্রায একাত্ম হয়ে যায। বিষয়-বিষয়ীব এই নিজেদেব হাবিয়ে একটা উচ্চতব সমন্বয় পেতে চাওয়াব বেদনাই হ'ল বস, যা মানুষেব 'চিৎ'-এ উদ্ভূত হ'ল। বিষয়-বিষয়ীর এবম্প্রকাব দ্বন্দ্বের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন বিষয়ীব নিজেকে বিষয়ে যতটা সম্ভব হাবাতে পাবা। তা যদি না পাবল, বিষযও ঠিক ধবা পডল না, বিষযীও ঠিক ধবা পডল না, রস জমল না।

বিষযী নিজেকে যতখানি বিষযে লীন করতে পারে, নিজেব সত্তায প্রসারিত হতে পাবে, রসে বিষয় ততখানি ধরা দেয়, বিষয়ী যত প্রাত্যহিক চৈতন্যের দ্বারা সঙ্কুচিত থাকে, নিজেকে ডোবাতে পাবে না, বিষয় ততদূবে সরে যায়। সহজ ভাষায়, সমগ্র সত্তায়, চেতনার গভীবতায় 'বিষয়' ধরা পডলে, বিষয় ফোটে, সত্তার রূপও ফোটে ; শিল্প বিষয়-

বিষয়ী-আত্ম হয় অর্থাৎ সমালোচকদের 'বিষয়-আত্ম' হয়। সঙ্কুচিত সত্তা দিয়ে বিষয়কে ধরতে গেলে, উপলব্ধির জড়, অভ্যাসজ রূপ প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করতে হয়, বিষয় ঠিক ধরা দেয় না, বিষয়ীরও খণ্ডিত, অতি-প্রাত্যহিক, বাহ্যিক রূপটাই প্রকাশ পায়; 'বিষয়ী-আত্ম' শিল্প বলতে সমালোচকরা যা বোঝাতে চান, তাই হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, বিষয়-বিষয়ী যতক্ষণ একেবারে একাত্ম, ততক্ষণ রসভোগ থাকে, প্রকাশাবেগ হতে পারে না। প্রকাশের আবেগ আসে একাত্মতা বিগত বা অসম্পূর্ণ ও আভাসিত হলে। ঠিক পাচ্ছি না অথচ পেতে যাচ্ছি, চিত্তে এইভাব থাকলে, আসে 'প্রকাশ'। প্রকাশ হচ্ছে পাওয়ার পথের সহায়, এ কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করেছি।

শিল্পে বাস্তবতা

সার্থক 'শ্রম'-মাত্রই সৃষ্টি—শুধু তার উদ্দেশ্য নয়, তার প্রক্রিয়াও সৃষ্টি। 'শ্রম'-এর অর্থ এখানে ধরছি প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংস্পর্শ। মানুষের—তাব সভ্যতার—ইতিহাস মূলতঃ এই শ্রমেরই ইতিহাস। শ্রমসূত্রে মানুষ শুধু উপলব্ধি, শুধু চেতনাই পায় নি, পেযেছে তার ভাষা, তার চিন্তাশক্তি, বস্তুতঃ যা কিছু মানুষকে পশু থেকে বিশেষিত করে, সে সবই। কাজেই উপলব্ধিজাত শিল্পের ও বিজ্ঞানের অন্তিম উৎসও শ্রম। শ্রমসূত্রে মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করেছে, সে সমস্তই শ্রমেব সমৃদ্ধির অনুকূল, অর্থাৎ জীবন প্রস্ফুটনের সহায়ক; কারণ, শ্রমই মানুষের কাছে প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে চলেছে, মানুষকে প্রকৃতিব উপব কর্তৃত্ব দিযেছে, তাকে পূর্ণতব জীবনেব দিকে এগিযে নিয়ে যাচ্ছে। অন্তিম বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রমই জীবন-সৃষ্টি।

জীবন হতে উৎসারিত হযে জীবনকে যা পুষ্ট করে, সমৃদ্ধ করে, তার নিজের পুষ্টি বা সমৃদ্ধিও আবার নির্ভব করে ঐ জীবনেরই সেবা ক'বে;—মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশের এটাকে একটা সাধারণ সূত্র ধরা চলে।

শিল্পসৃষ্টি জীবনসৃষ্টির অংশমাত্র। সুতবাং শিল্পের সার্থকতা জীবনের পুষ্টিসাধন ক'রে। জীবন-নিবপেক্ষ শিল্পের শিল্পত্ব

নাই, সার্থকতা নাই। 'শিল্পেব জন্যেই শিল্প' বলতে যদি শিল্পকে জীবন-নিরপেক্ষ বোঝায়, তাহলে ঐ উক্তি নিঃসাব। শিল্পী বা বসিক এবিষয়ে সজাগ না থাকলেও শিল্পের লক্ষ্য আছে, সমস্ত শ্রমের যা লক্ষ্য—পূর্ণতর জীবনেব সাধনা।

জীবনেব মূল হতে যে উপলব্ধি উৎসাবিত হয়, তাবই প্রকাশনায জীবনেব স্ফূর্তি সম্ভব, অন্যথা নয। এ উপলব্ধি সমগ্র সত্তাব উপলব্ধি। মানুষের সমস্ত সত্তা যেখানেই নিজেকে হাবিযে, নূতন অসীমতায ফিবে পায, সেইখানেই সৃষ্টির উপলব্ধি জন্ম নেয়। (যেমন, নবনাবীব যৌন সঙ্গমে।) এই উপলব্ধিব রূপ চাওযা তখন অব্যর্থ হযে ওঠে—শিল্প হয়ে ফোটা অব্যর্থ হযে ওঠে। শিল্পে মানবাত্মা নিজেকে নূতন ক'বে সৃষ্টি করে—নিজেব বিরাটতব, সুন্দবতর, সম্পন্নতব রূপকে প্রকাশ করে। এই জন্যেই, শিল্প জীবনেব জড প্রতি-বিম্বমাত্র নয়। যা আছে, শিল্প শুধু তাকেই প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত হতে পাবে না, যা হতে পাবে, যা হতে যাচ্ছে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ক'রে যায। উপলব্ধিব শিল্পরূপ তাব বিজ্ঞান-রূপের মতই মানব-প্রগতিব অস্ত্র ঃ পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের সত্য আবেদন কবে বুদ্ধির কাছে, বিচারের কাছে; আর শিল্পেব আবেদন প্রাণেব কাছে, সমগ্র মানবাত্মার কাছে। শিল্পকে জীবনেব প্রতিবিম্ব বললে, শিল্পের সক্রিযভাবে আত্মাকে পূর্ণতাভিমুখী করার ধর্ম অস্বীকার করা হয়।

শিল্পে বাস্তবতা

জীবনেব সুগভীর উপলব্ধি—বিশ্বেব ডাকে সত্তার সাড়া—মানুষেব ব্যক্তিজীবনকে মগ্ন করে তাব সামাজিক বা প্রাকৃতিক সত্তায, মানবাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করে তাব সামাজিক ও প্রাকৃতিক অধিকারে। শিল্প মানুষেব এই স্বত্বের দলিল।

অনেকে বলেন, বহির্জীবনের, প্রাত্যহিক জীবনেব যথাযথ চিত্রই—ফটোগ্রাফই—হ'ল বাস্তব চিত্র। প্রশ্ন কবা যেতে পাবে: সে চিত্র কি 'জীবনেব সত্য' হয়ে ওঠে? সমস্ত সত্তাব উপলব্ধিব সঙ্গে সঙ্গত না হযে এলে, প্রাণেব সত্য কি পাওযা যায়?—যায় না। মগ্ন চৈতন্য হ'ল মানুষের প্রাকৃতিক সত্তাব উপলব্ধির স্থান—সেখানেই সকল জানাব সেরা জানা; তাব জানাটাই জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাব অঙ্গ হয়ে অন্তরতম সত্য হয়ে ওঠে। এখন, মগ্ন চৈতন্যেব সত্য ও বহিঃ-চেতনাব সত্যের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। উপলব্ধিব সত্য বহিঃ-চেতনাব জোগানো শব্দে, রেখায়, সুরে আত্মপ্রকাশ করলেও বহিঃ-চেতনার শাসনাধীন নয়, ববং কখন কখন বহিঃ-চেতনাকেই শাসন কবে, প্রভাবিত কবে। উপলব্ধিব প্রকাশক শিল্প এই জন্যেই বহিঃ-চেতনার বিচাবকে উপেক্ষা ক'বেও মানবেব চিত্তকে বসসিক্ত কবতে পারে। লোক-সাহিত্যেব বা রূপ-কথাব বাহ্যিক অবাস্তবতাব পশ্চাতে তার সজীবতা বসিকমাত্রেরই আদবের বস্তু।

মিলেৎ এই কথাটা আব এক ভাবে প্রকাশ কবেছেন।

তিনি সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে : "সৌন্দর্য শিল্পের বিষয় থেকে উদ্ভূত নয় ; সেই বিষয়কে রূপ দেওয়ার প্রয়োজন-বেদনা থেকে তার জন্ম।" শিল্প বিষয়াশ্রয়ী নয় ; রসাশ্রয়ী, উপলব্ধি-আশ্রয়ী ; বিষয় শিল্পে রসরূপী। শিল্প বাস্তব হয় গভীর উপলব্ধির অধিকারে। উপলব্ধি যেখানে সামাজিক বা প্রাকৃতিক, শিল্প সেইখানেই বাস্তব—বিষয় বর্ণনা একান্তই গৌণ। প্রাকৃতিক বা সামাজিক সত্তা পূর্ণ, অপরাজেয়, অমর ; ব্যক্তির মৃত্যু আছে ; সমাজের, প্রকৃতির তো নাই ? শিল্পের মধ্যে মৃত্যুও তাই শোকদ নয়। শিল্পে তাই মানুষের সকল পরাজয় বিরাট মানব-জীবনের পটভূমিকায় প'ড়ে, ছন্দে প'ড়ে, জয়ের গৌরব পায়।

লয়লা দেখতে বিশেষ সুন্দরী ছিল না, কিন্তু মজনু সমস্ত সত্তা তার মধ্যে মগ্ন ক'রে তার অপূর্ব রূপ আবিষ্কার করেছিল। লয়লার এ রূপ গভীর উপলব্ধির সত্য—প্রেমের সত্য। শিল্পে মানুষ মানুষের এই ধরণের উপলব্ধি প্রকাশ করে ; তাই শিল্পে মানবাত্মার যে স্ফূর্তি, সে স্ফূর্তি নাই চোখের সাক্ষ্যে, কানের সাক্ষ্যে, কোনো ইন্দ্রিয়, কোনো বিচার বুদ্ধির সাক্ষ্যে। সমগ্র সত্তার সাক্ষ্যেই কেবল মানুষ নিজেকে অমর ঘোষণা করতে পারে। সমগ্র সত্তার স্বীকৃতিই কেবল শিল্পের বাস্তবতা প্রমাণ করে।

শিল্পে অধ্যাত্ম সাধনা

মানবাত্মা চায় সবার স্বরের সাথে স্বর মেলাতে; সমাজে, প্রকৃতিতে সবকিছুর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হতে, সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ভাবে আসতে। সকলের সঙ্গে একাত্মতাই মুক্তি—মানবাত্মা মুক্তির সন্ধানী। কিন্তু মুক্তি কী?

মুক্তি হচ্ছে সর্বপ্রকারের অভাব-বোধ-হীনতা। দুঃখের কারণকে দূরে রেখে, এড়িয়ে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ ক'রে মুক্তির স্বপ্নের কথা আমরা জানি। মানুষ সৎ-কে, চিৎ-এর বহিঃস্থ সবকিছুকে যতদিন জয় করার কথা ভাবতে পারে নি, ততদিন মানুষের মুক্তির পথ ছিল চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করা। সভ্যতার অগ্রগতির পথে চেতনা বিকশিত হওয়ায়, মানুষ যখন ভাবতে পারছে যে প্রকৃতিকে জেনে তাকে জয় করা সম্ভব, তখন মানুষ মুক্তি খুঁজছে চিত্তবৃত্তির অবাধ স্ফূর্তিতে। মুক্তির একটা উপায় অন্তর্মুখ, অন্যটা বহির্মুখ।

অভাব কেন হয় বুঝলে, মানুষের অভাব মেটানোর পথ মেলে।

সৎ-এর সঙ্গে চিৎ-এর মিলন-বিরহ-লীলা উপভোগের নাম আনন্দ। এই আনন্দের অনুপস্থিতিতে হয় অভাব। অভাব হচ্ছে অন্তিম বিশ্লেষণে আনন্দের অভাব। হিন্দুদর্শন বলে,

মায়া হতে দুঃখের—অভাব-বোধের উৎপত্তি। মায়া কী? সৎ-চিৎ-এর সম্বন্ধে জড়তা এলে, যে সম্বন্ধ অবিরত নবায়মান, অবিরত পথ-চল্‌তি হওয়া উচিত—তাতে জড়তা এলে, পথ-চল্‌তি চিৎ কোনো সৎ-এ আটকা পড়লে, আসে মায়া। মানুষের সব সত্যিকার পাওয়া হচ্ছে নিজেকে হারিয়ে পাওয়া, ব্যক্তির পাওয়া নয়, মানুষের সামগ্রিক সত্তার পাওয়া। চিৎ যেখানে পাওয়ার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে সজাগ, সেখানে সে আট্‌কে যায়, ঠিকমত পায় না, মায়ায় জড়িয়ে যায়। সৎ-এর সঙ্গে চিৎ-এর ছন্দ কাটে, মায়া জন্মায়। মানবাত্মা চায় এই মায়া হতে মুক্তি। মানুষ চায় পথ-চল্‌তি মন। এই মন দিয়েই সৎ-কে গভীর ভাবে পাওয়া যায়, সৎ-এর এবং নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায়।

মানুষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সমাজে শ্রেণীভেদের ফলে সামাজিক মানুষই—(প্রাকৃতিক মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম,) এ পর্যন্ত নিজের সত্তাকে খণ্ডিত ভাবে পেয়ে এসেছে ; সমাজের সবার সঙ্গে সুর মেলাতে পারে নি। কিন্তু সমাজ-বিকাশে এই শ্রেণীভেদ এসেছিল, যাতে উত্তরকালে মানুষের পক্ষে সচেতনভাবে নিজসত্তা অনুভব করা সম্ভব হয়—তার জন্যে। প্রকৃতির কাছে মানুষ যতদিন ছোট ছিল, প্রকৃতির জ্ঞান যতদিন তার পর্যাপ্ত হয় নি, ততদিন মানুষ তার প্রাকৃতিক সত্তাকেও সচেতনভাবে পায় নি

কিন্তু মানুষ এই দীর্ঘ ইতিহাসে অবিরাম চেয়ে এসেছে—সবার সাথে সুর মেলাতে। এটা তার ক্রমবিকাশের মূলের তাগিদ—অন্তরতম চিত্তের তাগিদ। চিৎ-কে—মনের গভীরতম স্তরের বস্তুকে বহিঃ-চেতনার স্তরে আনার এ আবেগ আদিম। শিল্পের পশ্চাতে যে আবেগ, সেটা মানুষের বিকাশের আবেগ।

মানুষ চলেছে সচেতনভাবে স্ব-ভাবে পৌঁছুতে। মানুষের সর্বসাধনার মূল রহস্য এই—শিল্প-সাধনারও বটে।

শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব

শিল্প ব্যক্তির রচনা, সন্দেহ নাই; তবু তা ব্যক্তির রচনা নয়। এই স্বতঃ-বিরোধের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সামাজিক ব্যাপার। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব জন্ম নেয়, বিকাশ পায়, তার গুণ পরিস্ফুট হয়। ব্যক্তিত্বের ধারণা, ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, ব্যক্তিত্বের গুণ—সবই সমাজ-সাপেক্ষ। সোজা ভাষায়, ব্যক্তি শুধু ব্যক্তি নয়—সে সামাজিক জীব, প্রাকৃতিক জীব।

শিল্পের ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পারে, কারণ শিল্পী তখন ব্যক্তিমাত্র নয়, সে মানুষ। শিল্প মানুষের একান্ত ব্যক্তিসত্তার তোয়াক্কা রাখে না,—বহন করে তার সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তার পরিচয়। শিল্পের যা প্রাণবস্তু, সেটা মানুষের সামাজিক উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত, তার প্রাকৃতিক উপলব্ধি হতে উদ্ভূত। এ উপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা সাধারণতঃ সচেতন নই, কারণ এ উপলব্ধি অবচেতন চিত্তের। অথচ সর্ব চিন্তা ও ভাবের, সকল কর্ম-প্রেরণার মূলে এই উপলব্ধি। সর্ব প্রেরণার মূলগত এই উপলব্ধি সম্বন্ধে সচেতন নই বলেই আমরা ব্যক্তিগত জীবনকে এত প্রাধান্য দিই, অথচ এই

'গুহাহিত' উপলব্ধিই মানুষের সাড়ে-পনেরো আনা, ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি তো এব কাছে অতি সামান্য।

য়ুঙ্গ ঠিকই বলেছেন—"বুদ্ধিজাত ধ্যান-ধাবণা আমাদের কর্মধাবাকে সবচেযে কম প্রভাবিত কবে। আমাদের গোপন মনের অভিজ্ঞতা যখন ধ্যান-ধরণারূপে মূর্ত হয়ে ওঠে, তখনই তা প্রাবল্য .পায়, যুক্তিতর্কেব বাঁধন মানে না, নীতির প্রশ্নকে উপেক্ষা ক'বে চলে ; মানুষ বা তাব মস্তিষ্ক তখন তার সঙ্গে পেবে ওঠে না। মানুষ ভাবে, সে-ই বুঝি এই সব ধ্যান-ধারণার জন্মদাতা ; আসলে কিন্তু ঐ গুলোই তাকে ছাঁচে ফেলে, মানুষকে তাদেব অনিচ্ছুক মুখপাত্র ক'রে তোলে।"

মার্ক্স-এঙ্গেলস্ পত্রাবলীতেও মতবাদের উৎপত্তিব মোটামুটি এই বকমের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। "যে প্রেরণাব বশে দার্শনিকের দর্শনধারা গড়ে ওঠে, সেটা তার অজ্ঞাত থেকে যায়। দার্শনিক সজাগ ভাবেই কাজ করেন বটে, কিন্তু সেটা সত্যিকার সজাগতা নয।"

সামাজিক ও প্রাকৃত সত্তাব উপলব্ধি মানুষের মৌলিক উপলব্ধি। প্রাণশক্তি হতে উদ্ভূত ব'লে প্রাণশক্তিকে স্পর্শ কবতে পাবে এই উপলব্ধি। শিল্পী এই উপলব্ধিকে রূপায়িত করেন—অবচেতনকে চেতনার স্তবে আনেন। এই জন্যেই শিল্প ও শিল্পী হচ্ছে, স্টালিনেব ভাষায়, 'আত্মাব কাবিগব।'

উপরের আলোচনা থেকে আমরা পাচ্ছি, যে-শিল্প যত

নৈর্ব্যক্তিক, তা তত প্রাণবান। কথাটা ভুল বোঝা সহজ, কারণ ঐ কথাই এরকম ভাবেও বলা চলে, "যে-শিল্প যত ব্যক্তিত্বময়, সেটা তত প্রাণবান।" ব্যক্তিত্বের সমস্তটাই প্রায় সামাজিক ও প্রাকৃতিক। অস্কার ওয়াইল্ড তাঁর 'ডি প্রোফাণ্ডিসে' যখন বলেছেন, "অধিকাংশ মানুষই যেন অন্য মানুষ, তাদের ভাব চিন্তা সবই অন্যের।" তখন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বাক্‌চাতুরী করেন নি। অধিকাংশ মানুষই এখনও ব্যক্তিত্বে পঙ্গু, গণ্ডীবদ্ধ, অধিকাংশ মানুষেরই সত্তা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার রূঢ়তায় আত্মরত। সামাজিক ও প্রাকৃতিক সত্তার উপলব্ধি যত গভীর, যত বেশী, সমগ্র মানুষের পরিচয় তত সুস্পষ্ট। ব্যক্তির প্রখর উপলব্ধি এই জন্যই নৈর্ব্যক্তিক,—সামাজিক, প্রাকৃতিক।

সমাজ-ব্যবস্থায় জড়তা থাকতে পারে, সমাজ-দেহে জড়তা থাকতে পারে, কিন্তু সমাজ-প্রাণের—প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রাণশক্তির জড়তা নাই ; তা সর্বদা প্রবহমান। সামাজিক উপলব্ধি রূপায়িত হলে এই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয়। শিল্পে মানুষ নিজেকে চেনে, মানুষ আপন বিরাট সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এলিস্ তাঁর 'জীবন নৃত্য' গ্রন্থে যেখানে বলেছেন ঃ "মানুষ যখন তার স্ব-সত্তার চরমে পৌঁছায়, তখন সে সমূহের নমুনা হয়ে ওঠে।" মানুষের গভীরতম উপলব্ধি যে সামূহিক উপলব্ধি, এ কথার ইঙ্গিত যুগে যুগে

মনীষীরা দিয়ে এসেছেন। যুগে যুগে শিল্প এই সত্যেরই সাক্ষী হয়ে এসেছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শিল্পে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়লে শিল্প কি পঙ্গু হয়? স্ট্রিণ্ডবের্গ, ডস্টয়এফস্কি প্রভৃতির সাহিত্যে তাঁদের ব্যক্তি-জীবনের ছায়া অতি সুস্পষ্ট। তাঁদের শিল্প কি পঙ্গু? এর উত্তর: শিল্পে যা ব্যক্তির ছায়া ব'লে ধরা পড়ে, সেটা পঙ্গুতাই। ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনা যখন 'গুহাহিত' মনের রসে জারিত হয়ে বেরোয় তখন তা আর ব্যক্তির থাকে না—সামূহিক হয়ে ওঠেই। যা ছায়াপাত করে তা ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যক্তিত্বের ব্যাহতি—frustration। চিত্তরসে জ্যোতিঃস্নান তার হয় নি। পূর্বের একটা উপমা ব্যবহার ক'রে সেইজন্যে বলতে হয়, "মনপেঁয়াজের উপরকার খোসায় যতই রঙ ধরুক, তার প্রকাশে শিল্প হয় না। প্রাণের—বীজের—তেজে তাতে যে রঙ ধরে, তাকে রূপ দিতে পারলে, হয় শিল্প।"

শিল্প ও শিল্পী

শিল্পেব স্রষ্টা শিল্পীব মন। কিন্তু এ মন তার ব্যক্তিমন নয়, তার সামগ্রিক মন—তাব সমগ্র সত্তা। এই কথাটা ভুলে যাই ব'লে আমরা শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে বিভিন্নতার সম্ভাবনা কল্পনা করি।

অনেকে বলেন, শিল্পেব সঙ্গে শিল্পীব বিশেষ সম্বন্ধ নাই। টেনিসন্ জীবনে নাকি ছিলেন অভব্যভাষী, কাব্যে কী চোস্ত! দান্তে কাব্যে বিয়াত্রিচের একনিষ্ঠ প্রেমিক, সুনীতিপূর্ণ, অথচ জীবনে নাকি ছিলেন একেবারে 'লুচ্ছা'।

কথাটা কি ঠিক? হুইটম্যান্ তাঁর কাব্যের ভূমিকায় বলেছিলেন, "আমার এ কাব্যে যে হাত দেবে, সে একজন মানুষকে স্পর্শ করবে।" কাব্য ও কবির ঐক্য স্বীকাব কবেছেন তিনি। মিল্টনের ধারণা ছিল, বড কাব্য রচনাব জন্যে বড় মানুষ হওয়া প্রয়োজন। তাঁব বক্তব্য সম্ভবতঃ ছিল, মানুষেব একান্তভাবে নিজস্ব যদি কিছু থাকে, তবে সে তার আত্মা; আর কাব্যে মানুষেব আত্মাই প্রকাশ পায়। কাব্যে থাকে মানবাত্মার প্রসারেব, জয়যাত্রাব পদচিহ্ন। বড—সুদূরপ্রসারী আত্মা না হলে বড কাব্য কেমন ক'রে সম্ভব?

ব্যক্তি-জীবন হচ্ছে মানুষের একেবারে বাহ্য জীবন।

মানুষেব প্রাণের পরিচয় সেখানে কম। মনের গভীর ধারা ব্যক্তি-জীবনে ধরা পড়ে না। পড়লেই, তা সামগ্রিক রূপ নেয়।

সবকিছুর সত্য পবিচয তার সমগ্রতায়। সমগ্র সত্তায় মানুষ আত্মস্থ; পূর্ণতাব বোধ সমগ্র সত্তার ঐক্যবোধ। এখানে ইংবাজ মনীষী হ্যাভ্‌লক এলিসের একটা উক্তি মনে পড়ছে :—"He who carries farthest his most intimate feelings is simply the first in file of a great number of other men, and one becomes typical by being to the utmost degree one's self"—একান্তভাবে নিজস্ব অনুভূতিকে চরমে যে নিয়ে যায় সে অন্য-বহুর পুরোগামী; মানুষ যখন সবচেয়ে বেশী আত্মস্থ, তখনই সে বহুর প্রতিনিধি হযে ওঠে।

মানুষ এই আত্মস্থ-ভাবে, এই সমগ্রসত্তায় স্থিত ভাবেই শিল্পসৃষ্টি করে। শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা, সামগ্রিকতা শিল্পীর সমগ্র সত্তা থেকেই আবির্ভূত হতে পারে। সমগ্র সত্তায় মানুষ, আসল মানুষ, পুরো মানুষ।

শিল্পের বিষয়-বস্তু জীবনস্রোতের উপলব্ধি। জীবন-স্রোতের উপলব্ধির চেয়ে মানুষের একান্তভাবে নিজস্ব কী হতে পারে? শিল্প শিল্পীর একান্ত নিজস্ব না হয়েই পারে না। একান্ত নিজস্ব তবু একান্ত সামগ্রিক!

শিল্প হচ্ছে জীবনেব প্রকাশ, কিন্তু জীবনেব গভীরতম অনুভূতি প্রকাশেব নয়। সেটা সমুদ্রেব মত, তাব ভাষা নাই—ভাষা ফোটে কূলে আছড়ে প'ড়ে, সামুদ্রিক পাহাড়ে ঘা খেয়ে। জীবনেব টুকবোগুলি শুধু চেতনায রূপ নিতে পাবে। তাই শিল্পেব বিষযবস্তু হচ্ছে জীবনেব নানা টুকবো, জীবনেব স্রোত থেকে খসা, কল্পনায় পুষ্ট নানা অভিজ্ঞতা। বৌদ্রেব সাদা বঙ চোখে দেখা যায় না, রামধনুতে যখন খণ্ডিত ও বিচিত্রবর্ণ হযে বেবোয, তখন তা চোখে ধবা পড়ে। শিল্পেও তেমনি জীবনস্রোতটা ঠিক ধরা দেয় না ; ধবা দেয রামধনু-বঙা জীবনেব খণ্ডগুলি। এই টুকবোগুলি—খণ্ডিত অভিজ্ঞতাগুলি একক ভাবে অর্থহীন ; বসে জাবিত হযে এবা ঐক্য পায়—অখণ্ড জীবনেব আভাষ দেয।

আমবা বলছি, বস সমগ্র সত্তার বস্তু তাই একান্ত নিজস্বও। বিষযেব দ্বারা সমগ্র সত্তা অনুবঞ্জিত না হলে, বসেব উদ্ভব হয় না। বস ঐক্য আনে শিল্পে—অখণ্ড জীবনে আভাষ আনে, গতি যেমন সিনেমাব খণ্ড খণ্ড ছবির মধ্যে সজীবতাব ভ্রান্তি আনে। আঙ্গিকেব জোবে ঐক্যের মত একটা জিনিষ আসতে পারে কিন্তু সজীবতা আসে না।

কয়েকটা শিল্প আছে—যেমন সঙ্গীত যা এমনিই নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিকতা, আব সামগ্রিক সত্তার নৈর্ব্যক্তিকতা এক জিনিষ নয়। শিল্পীচিত্তের রস-সংযোগ না হলে, সত্যিকাব

নৈর্ব্যক্তিকতা আসতে পারে না। 'ব্যক্তি'-র সামগ্রিকরূপে —পূর্ণরূপে—প্রকাশেই সত্যিকার নৈর্ব্যক্তিকতা সম্ভব।

যে প্রশ্ন তুলে প্রবন্ধ আরম্ভ করেছিলাম, তাতেই ফেরা যাক। টেনিসন দান্তে প্রভৃতির কাব্যের সঙ্গে তাঁদের জীবনের গরমিল দেখি কেন? এ 'কেন'র উত্তর সহজ। মানুষ সাধারণ জীবনে খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের মানুষ, কবি হিসাবে তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণতার অভিমুখী। শিল্পে সাধারণ, নিত্যকার জীবনের প্রকাশ হয় না, পূর্ণতাভিমুখী জীবনের প্রকাশ হয়। শিল্পের উদ্দেশ্যই যে মানুষকে মুক্তির পথে নিয়ে চলা, জীবনকে বিকাশের পথে নিয়ে চলা। সত্যিই, দান্তের প্রতিদিনের ব্যক্তি-জীবনটাকে সত্য বলি কী ক'রে? তাঁর প্রাণের মধ্যে যে দুঃসহ পূর্ণতার স্পৃহা তাঁকে জীবনে শান্তি দেয় নি, সেইটা কি বড় সত্য নয়? দান্তের সমগ্র সত্তার মহত্বে সন্দেহ করবার মত কোনো ইতিহাস নাই।

শিল্প সৃষ্টিতে মানুষের ইচ্ছার কোনো দান নাই, কিন্তু সৎ-কে মানুষের মনের ভিতরেই জারিত হয়ে বেরুতে হয়। শিল্পীর চিত্ত যদি স্বচ্ছ না থাকে, যদি সঙ্কীর্ণ, কলঙ্কিত হয়, শিল্পে সৎ-এর প্রকাশ কী ক'রে পূর্ণতাভিমুখী হবে, মহৎ হবে?

জীবনের সব ক্ষেত্রেই উপনিষদের এই বাণী সত্য :—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

শিল্প, সমাজ, শ্রেণী

শিল্পের যুগধর্ম আলোচনা করতে গিয়ে একটা জিনিষ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সেটা হচ্ছে :—সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি, সুতরাং সমাজের সাধারণ কাঠামো, শিল্পের শুধু উপকরণের উপরই নয়, তার রূপ, তার আঙ্গিকের উপরও প্রভাব স্থাপন করে। এরকম হবার কারণ অবশ্য এই যে, কল্পনা যা অভিজ্ঞতায় আসে তাকেই নানাভাবে সাজিয়ে নিতে পারে মাত্র; উপলব্ধি বাস্তবের ভিত্তির উপরই দাঁড়াতে পারে এবং বিষয়ের নিগূঢ় শক্তি পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারে; কিন্তু প্রকাশটা তাকে পরিচিত জগতেই পেতে হয়।

মার্ক্সের ক্যাপিটাল গ্রন্থের পাদটীকায় মিশরের পিরামিড্ কী ক'রে সম্ভব হ'ল তার ইঙ্গিত আছে। এই ইঙ্গিত ধরে আমরা বুঝতে পারি, মিশরের পিরামিড্ সম্ভব হয়েছিল, সেখানকার তাৎকালীন সমাজ-কাঠামোর সাধারণ চরিত্র অনুসরণ ক'রে। নীল নদের কৃপায়, সমাজের শ্রম তথাকার সমাজ-ব্যবস্থায় তার সাধারণ অভাব মিটিয়ে থাকত উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত দাস-শ্রম ছিল সমাজের চরম চালক 'ফারোয়ার' আজ্ঞাধীন। এই জন্যে, পিরামিডের উপলব্ধির উপকরণ ও তার সাধারণ রূপ সমাজ-কাঠামোর প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিল।

যেহেতু রাজা ছিলেন সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিচালক, তাই তাঁব পরাক্রম সামাজিক অবচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল। বিবাট দাস-সমাজেব উপলব্ধি রূপ নিল পিবামিডে; কৃষি-সভ্যতার মূলে তিনটি শক্তি—বাজশক্তি, পুরোহিত-শক্তি ও প্রাকৃতিক (দেবতারূপে কল্পিত) শক্তি—এই তিন-মুখী সমাজেব চালনা-শক্তি রূপাযিত হ'ল পিবামিডের ত্রিকোণ আকাবে, বিবাট দাস-শ্রমের উপবে স্থাপিত ক্রম-সঙ্কীর্ণ প্রভুত্ব, আব তাব চূডায ত্রিশক্তিব মিলনকেন্দ্র রাজা। তিনি প্রধান পুরোহিত এবং দেবাংশ। সুতবাং পিবামিড্ দেখা দিল বিরাটাকার, ত্রিকোণ, সূচ্যগ্র, দেবলোক-(গগন)স্পর্শী হয়ে।

শুধু এই উদাহবণ হতেই আমাদেব প্রামাণ্য বিষয় গ্রাহ্য বিবেচিত হয়ে যাবে, এরকম আশা করা যায় না। সমগ্র ইতিহাসেব ধাবায় এর সত্যতা যাচাই ক'বে নেওয়া ভাল,—অবশ্য অতি সংক্ষেপে।

আদিম মানুষ ছিল শিকারী, সুতরাং আদিম মানুষের শিল্পেব কথাবস্তু ছিল শিকাব—শিকার কবতে গিয়ে মানুষ যেভাবে নিজেকে পেযেছে, তাব প্রকাশ। স্পেনের কোগুলা বা ভারতের মীর্জাপুর কি রামগডের গিবিগুহায শিকার-চিত্র দেখলে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আদিম কম্যুনিজমেব যুগে মানুষের সামাজিক সত্তা অখণ্ড ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব চালাতে গিয়ে মানুষ তখন তার

প্রাকৃতিক সত্তায যে উপলব্ধি পেযেছিল, সেইটেই ছিল শিল্পেব প্রধান উপকবণ সে-সময , —বহিঃপ্রকৃতিব সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতিব আত্মীযতাবোধই ছিল তখনকার শিল্পেব কথাবস্তু। এই জন্যেই দেখি, এ যুগেব শিল্পে—যেমন বৈদিক সাহিত্যে—ছুই এক হয়ে, প্রকৃতিই যেন আত্মপ্রকাশ কবেছে , সমস্ত শিল্পেব মধ্যে মানবাত্মা তাব অখণ্ডতা ঘোষণা কবেছে।

এব পবে এল কৃষি-সভ্যতাব যুগ—গোষ্ঠীপতির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যেব যুগ। কৃষি-সমাজে তিনটি মূল চালনী শক্তিব কথা উল্লেখ কবেছি—প্রাকৃতিক শক্তি, সমাজ-চালনী ও বক্ষণীশক্তি, আব সমাজেব পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা। প্রথম শক্তিব প্রতিনিধি দেবতাবা , দ্বিতীয়ের, বাজা , আব তৃতীযেব, পুবোহিত। কৃষি-সভ্যতাব দীর্ঘ যুগেব শিল্পে এই তিনশক্তিব সঙ্গে মানুষকে সমাজের প্রয়োজনানুরূপ আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে দেওয়াব সাধনা পবিস্ফুট। কৃষি-সভ্যতার বৈপ্লবিক যুগে—তার দ্রুত প্রসাব ও উন্নতির যুগে—শিল্পেব কথাবস্তু ছিল, এই প্রসারেব, সুতবাং প্রসাবকদেব কাহিনী। সমাজেব সেই স্ফূর্তিব মুখে জীবনের যাবতীয় বৈচিত্র্য সতেজ প্রাচুর্যে ফুটে উঠেছিল, সমগ্র সমাজ তাব সর্ববিধ উপলব্ধিকে রূপায়িত কবতে যেন উন্মুখ হযে উঠেছিল, প্রসাবকদেব মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষও নিজেব বিরাটাত্মাব পরিচয় কবতে ব্যগ্র হযেছিল। কৃষি-সভ্যতাব

এই প্রসারের যুগ ছিল রামায়ণের মত মহাকাব্যের যুগ। সমগ্র যুগ ও সমগ্র সমাজকে প্রকাশ করে মহাকাব্য। কৃষি-সভ্যতার প্রসারক—গোষ্ঠীপতি বীরদল, আর তাদের সহায় স্বরূপ প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধি 'দেবতাগণ,' একযোগে মানুষের স্বপ্নকে চঞ্চল ক'রে জন্ম দিয়েছিল মহাকাব্যের। কৃষি-সভ্যতার প্রসারের পর এল দৃঢ়ীকরণের যুগ, সংরক্ষণের যুগ, এই সভ্যতার পরিণতির যুগ। আমাদের দেশের এই যুগের মহাকাব্য মহাভারত। এই মহাকাব্যের কথাবস্তু সমাজ-ধর্ম-সংস্থাপন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমাজ-ধর্মের পথ নির্ণয় হয়ে গেল। এর পরে, কৃষি-সভ্যতায় প্রগতি স্তিমিত হ'ল, সমাজে জড়তা দেখা দিল, সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে দেশের ক্ষাত্র ও পুরোহিতশক্তির সক্রিয় সম্বন্ধ শিথিল হয়ে পড়ল, জীবনে গতানুগতিকতা এল এবং তার ফলে শিল্পে দেবদেবী ও রাজা-রাজড়ারা বড় হয়েই রইল, কিন্তু তাদের অবলম্বন ক'রে শিল্পী মানুষের আদিম অন্তঃপ্রকৃতির প্রেম প্রভৃতি বন্ধনী-শক্তিগুলির উপলব্ধিকেই-মাত্র প্রকাশ করতে থাকল, প্রাণের স্ফূর্তির অভাব ঘটলে, জড় প্রবৃত্তির স্তরে টেনে এনেও পুরাতনের নকল হতে লাগল। সমাজের উপরের ও নীচের স্তরের মধ্যে উপলব্ধির বিভিন্নতা ঘটল; শিল্পে দু'টি ধারা দেখা গেল। এক দিকে, উৎপাদন ব্যাপারে প্রকৃতির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তারা তাদের চিত্তরসকে

সতেজই রাখল তাদেব জীবনেব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ; অন্যদিকে, উপবের শ্রেণীরা—বাজাবাজড়া ও পুবোহিতবা পুবাতন সংস্কৃতিব ভাণ্ডাবী হিসাবে গণ্য থাকলেও, তাদেব চিত্তবস এল শুকিয়ে। কৃষি-সমাজেব এই দীর্ঘ জডতার সময়ে, প্রাকৃত জনগণেব উপলব্ধি যখনই উপবেব স্তবকে বিপুল ভাবে নাড়া দিয়েছে, তখনই প্রকৃত শিল্প দেখা গিয়েছে। আমাদেব দেশে বৌদ্ধ যুগ ছিল এমনি একটা যুগ—সমাজের উৎপাদন ব্যাপাবে এ যুগে, বডগোছেব কোনও বিপ্লব ঘটে নি, তাই মানুষেব উপলব্ধি এ যুগে মহাকাব্যেব যুগেব মত সুদূবপ্রসাবী নয়। এ যুগ, সামন্ত-তন্ত্রেব যুগ, খণ্ড কাব্যেব যুগ, গাথাব যুগ।

এ পর্যন্ত যা বলা হ'ল, তা হতে কৃষি-সভ্যতাব দীর্ঘ ইতিহাসে শিল্পেব রূপ ও উপাদান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধাবণা করা যাবে, মনে হয়।

নিছক কৃষি-সভ্যতার পবে, মানুষেব প্রকৃতি-জযেব সাধনা দেখি পুঁজিদারী সভ্যতায়। সামাজিক উৎপাদনেব চালনা-শক্তি এবার এল ধনিকশ্রেণীতে। এ-সভ্যতার প্রথম উৎকর্ষ ইংলণ্ডে। তাই ইংলণ্ডেব ইতিহাসেব আশ্রয় নেওয়া গেল। এই সভ্যতাব বৈপ্লবিক যুগে, বিশেষ ক'বে, এব প্রথম দিকে, মানুষের স্বপ্ন আবার মানুষেব সম্ভাব্যতার উদার গগনে ডানা মেলল ; কিছু দিনের জন্যে ধনিকদেব প্রসারের মধ্যে সাধাবণ মানুষও নিজের প্রসাব-আবেগ অনুভব করল। ইংলণ্ডে এই যুগের

সাহিত্যে এলেন সেক্সপীয়র। তাঁর উপলব্ধির প্রসার ও গভীরতা সে-যুগের সামাজিক উপলব্ধিরই সূচিকা মাত্র। এলিজাবেথীয় যুগ ছিল ধনিকতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার প্রথম উষা। কাজেই ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন সে সময়ে সর্বতোভাবে উন্মুখ হয়েছিল ভবিষ্যতের একটা বিরাট সম্ভাবনার স্বপ্নে। নূতন উৎপাদন-প্রথা তখন সদ্য আত্মপ্রসার করছে, তাই জাতির নয়নে তখন শিশুর কৌতুক দৃষ্টি, বক্ষে নির্ভয় দুঃসাহস, কল্পনা অবাধ আনন্দে পাখা মেলেছে। বেকনের লেখায় এ যুগের দুঃসাহসিক মানসিক অভিযানের একটা চিত্র পাই, আর সেক্সপীয়রের সাহিত্যে পাই জাতির সমগ্র জীবনের একটা বিচিত্র রসরূপ। জাতির জীবনে তখনও পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ভাল ক'রে জাগে নাই—নূতন প্রথার বিকাশের পথে যে 'তছনছ' অচিরে অব্যর্থ হয়ে উঠবে, সেটা তখনও দেখা দেয় নাই। এই জন্যেই, সমাজ সমগ্রভাবে সহজে ধরা দিতে পেরেছিল সেক্সপীয়রের সাহিত্যে। এখানে প্রশ্ন ওঠে: এ সময়ে সাহিত্যের নাটক-রূপটাই এত প্রাধান্য পেল কেন? এর উত্তর—এ যুগ নূতন সম্ভাবনার স্বপ্নাবেশের যুগ, আর এসব সম্ভাবনা মানুষের মনে গড়ে উঠেছে মানুষকে ঘিরে। প্রাকৃতিক মানবাত্মার সঙ্গে সামাজিক জড়তার দ্বন্দ্ব রূপায়িত করা হ'ল নাটকের, বিশেষ ক'রে, বিয়োগান্ত নাটকের, ধর্ম। নূতন ঔৎপাদনিক প্রথায় মানবাত্মা স্বভাবতঃই এইসব সামাজিক

জডতাকে জয় কবাব স্বপ্নে চঞ্চল হয়ে ওঠে, সুতরাং নাটকরূপ এরকম যুগে একান্ত অব্যর্থ মনে হয়। এসব যুগে নাটকে ফুটে ওঠে একটা কথা :—মানবাত্মা সামাজিক জডতাব কাছে যতই আঘাত পাক, যতই আপাত-পবাজিত হোক, তা মহৎ, জডতাব চেয়ে অনেক শক্তিমান। সেক্সপীযবেব 'ওথেলো', 'এণ্টনি-ক্লিও-পেট্রা'ব মূলবাণী কি এই নয় ? এ তো গেল শিল্পরূপেব কথা। আঙ্গিকেব ব্যাপাবেও, সেক্সপীযবেব ছন্দে, বাক্যে, সবকিছুতে, সে যুগেব অবাধ আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রসাবেব তেজ মূর্ত হয়ে উঠেছে ; প্রথম যাত্রাব দৃঢপদক্ষেপও।

সেক্সপীযবেব পবেব আমলে, এলেন মিল্টন্ ও ডন্। সমাজে তখন পুবাতন ও নূতন উৎপাদন-প্রথাব মধ্যে বিরোধ পেকে উঠছে, সমাজ খণ্ডিত হযে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই দেখি এই দুই কবিব কাব্যেব দু'বকম ধাবা। ডন্ ছিলেন পাদ্রী, সুতবাং মোটামুটি সনাতনপন্থী। তাঁর প্রথম দিকেব কবিতায় যথেষ্ট মানবীয় বিদ্রোহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দিগ্ধতাব সুব, কিন্তু শেষদিকেব বচনায পার্থিব জীবনকে মায়া ব'লে অবাস্তব আধ্যাত্মিকতাব মহিমা প্রচাব বযেছে। ডন্ দোটানাব মধ্যে প'ডে ডুবে গেলেন। আব মিল্টন ? তাঁব কণ্ঠে উচ্চাবিত হ'ল পুরাতনেব জডতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব বজ্রবাণী। তিনি বললেন, "সকল স্বাধীনতার উপবে আমি চাই নিজ বিবেক মত জানবাব, প্রকাশ ও আলোচনা করবাব

স্বাধীনতা।" তাঁব 'প্যারাডাইজ লষ্ট' কাব্যের উদাত্ত, মিল-বন্ধনহীন ছন্দ, তাব বজ্রগম্ভীব ধ্বনিতবঙ্গ, 'সেটানেব' মত অপূর্ব চবিত্র সৃষ্টি—এ সবেব মধ্যে তাঁব সমযকাব সমাজেব সমগ্র বিদ্রোহ-রূপ জডতামুক্ত হযে ফুটে উঠেছে। সমাজের বৃহত্তম অংশেব বিদ্রোহী আত্মা মিল্টনের কাব্যে বাণীমূর্তি—মন্ত্ররূপ পেয়েছে।

মিল্টনেব পবে ইংলণ্ডেব বড কবি পোপ্ ও ড্রাইডেন্। এঁদেব সময চলেছে পুরোপুবি সন্দেহ, বিজ্ঞভাবে বিচাব। এটা মেপে পা ফেলাব যুগ ; নূতন ও পুবাতনেব মধ্যে আপোষ-চেষ্টাব যুগ। তাই এই দুই কবির আঙ্গিকে দেখি যুক্তিব বাহন গদ্যেব প্রভাব। তাঁদেব পদ্য হচ্ছে গদ্যধর্মী অথচ মিল-সন্ধানী। কোনও মহৎভাবে উপলব্ধ সত্য এঁদেব যুগে ছিল না, তাই এঁদেব মূলরস হ'ল ব্যঙ্গ।

পোপ্ ড্রাইডেনেব যুগেব জডতা কাটল ওযার্ডস্ওয়ার্থ-শেলীব আমলে। পুবাতন উৎপাদন-প্রথাব অনুসাবী সামন্ত যুগীয কর্তৃত্বেব স্থানে এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসেছে—ধনিকতন্ত্রেব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কাজেই এখন হ'ল খণ্ড কবিতা—গীতি-কবিতাব যুগ। বিচিত্র ঘটনা ও পবিবেশেব মধ্য দিযে ব্যক্তিকে ফুটিয়ে এখন সামাজিক মানুষকে রূপ দেওয়া চলে। এটা এই জন্যেই প্রধানতঃ উপন্যাসেবও যুগ। কিন্তু আমরা প্রধানতঃ কাব্যের আলোচনা করছি, তাই উপন্যাসেব কথা থাকল।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথাবস্তুতে ও ভাষায় সাধারণ মানুষ এল, নবযুগের আভাষ-স্বরূপ প্রাকৃতজনের আবাহন হ'ল। পরে অবশ্য তাঁর রুগ্ন বিবেক, সুতরাং আহত ও সঙ্কুচিত সত্তা, তাঁর কাব্যের মধ্যে জড়তা এনে ফেলেছিল। শেলীর "মুক্ত প্রমিথিয়ুস্" কাব্যে কিন্তু ধনিকতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথার সুস্পষ্ট জয়গীতির মধ্যে, এই প্রথার গর্ভস্থ মানবমুক্তির অনুকূল, নূতন কোনও প্রথারও আহ্বান ধ্বনিত হ'ল; তাঁর 'জীবনের জয়' নামক অসমাপ্ত কাব্যে মানবের মুক্তির অভিমুখে জয়যাত্রা মূর্ত হয়ে উঠল। এ সময়ে, ফরাসী বিপ্লবের ও তার পরের কালে, সমাজের শ্রমশীল জনসাধারণের বুকে যে রূপহীন আশা-চাঞ্চল্য এসেছিল, শেলী তার রসরূপ প্রকাশ করলেন। এই সময় বাইরণ পুরাতনের ভাঙনের সুর ভাঁজলেন।

শেলীর পরের যুগের বড় কবি ম্যাথু আর্ণল্ড ও ক্লাউ। ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এঁরা নিজেদের এবং সমাজকে পেলেন "Between two worlds ; one dead, one powerless to be born"—দুটো দুনিয়ার মধ্যে, তার একটা মৃত, অন্যটা জন্মানোর শক্তি পায় নি। ধনিকতান্ত্রিক সভ্যতার জড়তা তখনই মানবাত্মাকে পিষে ফেলেছে, সমাজকে মৃতকল্প ক'রে ফেলেছে, অথচ সমাজতন্ত্র জন্মাবার মত শক্তি তখনও দেখা দেয় নাই। টেনিসনের কাব্যেরও মূল সুর ওই। ধনিক সভ্যতার চরিত্র তাঁর কবি-দৃষ্টির অগোচর ছিল না।

ধনিক-সভ্যতাব ভাল ও মন্দ তাঁর কবি-আত্মার জানা ছিল। বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে তিনি বললেন :—

'The stars', she whispers, 'blindly runs'
* * * so careful of the type she seems
So careless of the single life,—

অর্থাৎ "বিজ্ঞান চুপি চুপি বলে, তারারা অন্ধ বেগে ছুটেছে। ...বিজ্ঞান সমষ্টি সম্বন্ধে এত সতর্ক ; কিন্তু একক জীবন সম্বন্ধে কী উদাসীন।" কথাটা আসলে প্রযোজ্য ছিল ধনিক-সভ্যতা সম্বন্ধে, টেনিসনেব ধনিক-ঘেঁসা মন বোঝাল, বিজ্ঞান। জর্জ মেবিডিথেব চিত্ত ছিল টেনিসনের চেয়ে অনেক মুক্ত—তাঁব সমাজ-চেতনা ছিল তীব্রতর। তিনি তাঁর যুগের অন্ধকাবের—জডতার মধ্যে বসেই গাইলেন—

Of good and evil at strife
And the struggle upward of all
And choice of the glory of life.

অর্থাৎ ভালমন্দেব দ্বন্দ্বের কথা—সকলেব উপবেব দিকে ঠেলে ওঠাব কথা, জীবন-মহিমা নির্বাচনের কথা।

আধুনিক ইংবাজী কাব্যের মূল সুব অনেকে আলোচনা কবেছেন। ধনিক প্রথাব চবম জড়তা ও বিলয়ের মুখে ধনিক ও শ্রমিক, এই দুই শ্রেণীতে সমাজ ভেঙ্গে পড়েছে। তাই একদল গাইছেন,

"London bridge is falling down, falling down"

অর্থাৎ "গেল—গেল—লণ্ডন সেতু ভেঙ্গে গেল।" এঁরা

ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। আব একদল গাইছেন, ধনিকতন্ত্রেব ধ্বংসেব মধ্যে সমাজতন্ত্রেব আবাহন-গান। এঁদেব আশা ও স্বপ্ন শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিবে। আঙ্গিকেব দিক হতে এ দুই দলই কিন্তু প্রায় একবকম। তাতে বযেছে শতধা খণ্ডিত ব্যক্তিত্বেব পবিচয। আঙ্গিকে চলেছে অবিরল উদ্‌ভ্রান্ত পবীক্ষণ.—এ আঙ্গিক অস্থাযী যুগেব আঙ্গিক। কাটা-কাটা ধ্বাবণাব সঙ্গে উপলব্ধি যোগ ক'বে এ কাব্য গড়ে ওঠে। সমাজে ব্যক্তিও তো এখন একান্ত নিষ্ঠুরভাবে একক,—চেষ্টা ক'বে তাকে সমাজ সত্তাব সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

ধনিকতন্ত্র উৎপাদান-প্রথাব পবে এসেছে সমাজতন্ত্র উৎপাদান-প্রথা। এই প্রথাব অঙ্কুবণেব যুগ হতে আমবা মানবীয় উপলব্ধিব একটা নূতন স্ফূর্তিব আভাষ পেযেছি। শিল্পেব বিষয ও আঙ্গিকে, গোর্কীব দুঃসাহসিক অভিযান এই প্রথাব বিদ্রোহাত্মক প্রথম স্তবেব সূচনা কবেছে। সোভিযেট রুশিযাব শিল্প-জীবনে যে অপূর্ব উল্লাস নানারূপে ফুটে উঠছে, তাব কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হবে, শুধু এইটুকু এখানে ব'লে বাখা যেতে পারে—এই নব যুগের পূর্ণ রূপ এখনও সেখানকাব শিল্পে ফুটেছে ব'লে মনে হয় না—শোলোকভেও না। সোভিযেট রুশিয়ায মানবাত্মাকে যে বিডম্বনাব মধ্যে দিযে আসতে হয়েছে তা দেখে, তাব পূর্ণ উল্লাসের মূর্তি ফোটবাব সময় গিয়েছে, এ কথা কোনোমতেই বলা চলে না।

আমরা সে মূর্তির অপেক্ষায় আছি। সোভিয়েট-আত্মার স্বপ্ন যে এযাবৎকালের সকল স্বপ্নকে ছাড়িয়ে উঠবে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমরা নিঃসঙ্কোচে করতে পারি।

শিল্পের সঙ্গে সমাজ ও শ্রেণীর গভীর সংযোগ দেখবার জন্যে যা বলা হ'ল, তাতে আমরা পাই :—শিল্পজীবনের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ, মানব-প্রগতির একটা চিহ্ন এবং তার সহায়ক। সামাজিক জীবন যত অবিভক্ত, সামাজিক উপলব্ধি তত ব্যাপক, তত শক্তিমান। প্রতি নূতন উৎপাদন-প্রথার প্রারম্ভে মানুষ দেখেছে তার সামাজিক জীবনে মুক্তির স্বপ্ন, তাই শিল্পে হয়েছে সমগ্র সমাজের রূপায়ণ। উৎপাদন-প্রথার জড়তা থেকে এসেছে সমাজের উপরের শ্রেণীগুলিতে উপলব্ধির জড়তা, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্বরত সাধারণ মানুষের উপলব্ধি কখনও জড়তা পায়নি, বরং উপরের স্তরের জড়তাকে বারে বারে নাড়া দিয়েছে। এই জড়তার সময়ে, শিল্পের স্ফূর্তি হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সামাজিক উপলব্ধির খণ্ডিতভাব ও অপূর্ণতার জন্যে, সামান্য। সামাজিক উৎপাদন-প্রথার জড়তার যুগে সমাজের উপলব্ধিতে এসেছে জড়তা, গতিহীনতা, গতানুগতিকতা, শিল্পে হয়েছে আঙ্গিকের চাতুরী আর কল্পনা-বিলাস, পুরাতন উপলব্ধিকে নিস্তেজ প্রবৃত্তির স্তরে নামিয়ে, তার পুনরাবৃত্তি।

প্রগতি শিল্প

"The æsthetic activity can always agree with the practical, because expression is truth" (ক্রোচে), কিন্তু "There is no sense in pursuing a literary career as though one were operating a bombing plane" অর্থাৎ,

রসের বস্তু প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, তাই ব'লে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে বোমারু বিমান চালানোর ভাবভঙ্গী নিয়ে আসাটা ভুল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ, বিশেষতঃ বিগত মহাসমরের পর হতে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, বিগত শতাব্দীর বার্তিক (economic) জীবনে যা পরম সত্য ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই ধনিকতন্ত্রের বনিয়াদ শিথিল হয়ে পড়েছে; রুশিয়ায় তা বিধ্বস্ত হয়েছে; অন্যত্র রাজশক্তির খুঁটির উপর ভর ক'রে টাল খেয়েও দাঁড়িয়ে আছে। বিগত শতাব্দীতে ধনিক-প্রধান গণতন্ত্রের মন্ত্রে মানুষ বশ মানত, এ যুগে তা লোকচক্ষে মর্যাদা হারিয়েছে।

বাস্তব জীবনের এমনি নানান অভিজ্ঞতা মানুষকে তার

জীবন-দর্শন বদলে ফেলতে বাধ্য করছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নূতন ৰূপ দিচ্ছে, তাব রুচিব পবিবর্তন ঘটাচ্ছে, বসানুভূতিব নূতন বিষয-বস্তু উপস্থিত করছে। একটা নূতন জীবনেব কখনো নিষ্প্রভ, কখনো প্রোজ্জ্বল স্বপ্ন তাকে সম্মুখের দিকে ঠেলে চলেছে।

ধনিকতন্ত্র এখনও উন্মূলিত হয় নাই। বাঁচার তাগিদে সে-পক্ষ হতে পুরানো জীবন-দর্শন, পুরানো ধবণ-ধারণ, পুবানো রুচি প্রভৃতি বজায় বাখার প্রবল প্রচেষ্টা চলেছে। স্বাভাবিক ভাবে সেটা সম্ভব নয়, তাই বাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রাধান্যের আশ্রয় নিয়ে, নূতনেব বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খল তৈরী ক'বে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিযন্ত্রণ ক'বে ধনিকতন্ত্রেব সে অপচেষ্টা চলেছে।

জীর্ণতাকে জয় ক'রে জীবন তবু এগিযে চলেছে, বর্তমানেব অনিশ্চয়তা ভেদ ক'রে নূতনের অঙ্গীকার ফুটে উঠছে; মানুষের মনে নূতন আশা ও নূতন বিশ্বাসেব সঞ্চার হচ্ছে। যে-সাহিত্যে জীবনেব এই জয়যাত্রা ৰূপায়িত, তারই নামকরণ হযেছে প্রগতি-সাহিত্য।

আমাদেব দেশেও বাস্তব জীবনের অভিনব অভিজ্ঞতার উপব ভিত্তি ক'রে একটা নূতন সাহিত্য গড়ে উঠছে। নূতন ভাব ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী 'আঙ্গিক' পরীক্ষিত হচ্ছে, বিষয-বস্তুতেও অভিনব রুচির পরিচয় মিলছে; নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নূতন সমালোচনা-রীতি দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু প্রগতি-সাহিত্যের নামে যা কিছু চলছে, তাকেই খাঁটি জিনিষ মনে করলে ভুল হবে; কারণ এর কতক আদৌ সাহিত্য নয়, কতকগুলির সর্বাঙ্গে অতি-আধুনিকতার ছাপ থাকলেও, সেগুলিতে ফুটেছে আধুনিক যুগের প্রগতিটা নয়, পুরানো যুগের উচ্ছিষ্ট, বীভৎস বিকৃতিটা। প্রগতি-সাহিত্যে সমাজের এই বিকৃতির দিক প্রতিফলিত হবে না, তা নয়। বিকৃতিও সত্য, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী সত্য সমাজের প্রাণশক্তির স্ফূর্তি। জীবনের নিকষেই সত্যাসত্যের অন্তিম পরীক্ষা হতে পারে, তাই বিকৃতিকে যখন বিকৃতি ব'লে চেনা যায় না, জীবনের 'প্রকৃতি'র ছদ্মবেশে সেটা যখন দেখা দেয়, তখন তার চেয়ে অসত্য আর কী হতে পারে?

প্রগতি-সাহিত্যের লক্ষণ কী? নিখিল ভারত প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির মঞ্চ হতে হিন্দী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ৺প্রেমচাঁদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাতে একটা সংজ্ঞার ইঙ্গিত আমরা পাই। তার এক জায়গায় আছে: ভাবাবেগপূর্ণ সুকুমার সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে সময় নষ্ট করার মত পর্যাপ্ত অবকাশ আমাদের নাই। আমাদের কাছে সেই কলা-সৃষ্টিই কাম্য, যা গভীর, যা কর্মে প্রেরণা দেবে। এর সরল মর্মার্থ: প্রগতি-সাহিত্য হবে মুখ্যতঃ প্রোপাগাণ্ডা।

প্রগতি-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটা প্রচলিত মত হচ্ছে:

সেটা হবে গণসাহিত্য, এমন সাহিত্য "যা ব্যক্তি-চেতনাসম্ভূত নয়, সমাজবোধেব উপব প্রতিষ্ঠিত ; তাব জন্যে কবির চাই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীব সঙ্গে নিববচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টি, চাই ইতিহাসেব অর্থনীতিমূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।" (আযূব, 'চতুরঙ্গ,' আশ্বিন)।

প্রথমে মুন্সীজীব কথাটা ধবা যাক। মার্কিণ সমালোচক J T. Ferrel প্রোপাগাণ্ডাব যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা এই "a method of conventionalising and epitomising thought and policy," সংজ্ঞাটা মানি বা না মানি, এটা অনস্বীকার্য যে, প্রোপাগাণ্ডাব পিছনে থাকে সচেতন মনেব বহু চিন্তা, বহু প্রত্যয, বহু যুক্তিতর্ক। কিন্তু নন্দনশাস্ত্রেব বিচাবে, সাহিত্য হচ্ছে স্বতঃউৎসাবিত বসানুভূতি; সাহিত্যিক তাকে রূপায়িত কবেছেন। Art is the expression of impression, not expression of expression" (ক্রোচে)। চারুকলা হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যঞ্জনা, রূপায়িতেব নয়। অবশ্য যা রূপাযিত হযেছে, তাও পুনঃ-রূপায়ণেব বস্তু হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে সেটাব চিত্তবসেব জারকে দ্রবীভূত হয়ে আসা প্রয়োজন। কাজেই, চারুকলাব বাজ্যে প্রবেশাধিকাব লাভেব পূর্বে প্রোপাগাণ্ডাকে বিদেহী হয়ে বসোপলব্ধিতে পবিণত হতে হয়, তার প্রোপাগাণ্ডাত্ব নিঃশেষে খোয়াতে হয়। কথাটা আর-একভাবে বোঝা যাক। সাহিত্যের

মনোবিকলন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আচার্য Jung তাঁর 'Modern Man in Search of a Soul' গ্রন্থের এক জায়গায় বলছেন "A great work of art is like a dream . for all its apparent obviousness, it does not explain itself and is never unequivocal. A dream never says 'You ought,' or 'this is the truth." মহৎ শিল্পমাত্রই স্বপ্নধর্মী , আপাত-সুস্পষ্টতা তার যতই থাক, নিজেকে তা ব্যাখ্যা করে না ; কখনও তা একার্থক হয় না। স্বপ্ন যেমন বলে না ঃ "তোমার এইটা করা উচিত," কি, "এইটা সত্য," মহৎ শিল্পও তেমনি যা আছে—সচেতন মনে হোক বা নির্জ্ঞান মনে হোক, বহিঃপ্রকৃতিতে হোক বা অন্তঃপ্রকৃতিতে হোক, অতীতের স্মৃতিতে হোক বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় হোক, যা আছে সেইটুকুমাত্র প্রকাশ করে ; যা আছে তা নিয়ে কী করতে হবে তার কোনো নির্দেশ দেয় না। এই অর্থেই শিল্প উদ্দেশ্যহীন। প্রোপাগাণ্ডা কখনও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, কাজেই তা সাহিত্যও হতে পারে না।

শিল্প কি প্রোপাগাণ্ডা হতে পারে? শিল্প কর্মপ্রেরণা দেয় সত্যি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। কর্মপ্রেরণা দেওয়াটা তার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য নয়।

দেখা গেল, সাহিত্য প্রগতির 'বাহন' হতে পারে না ;

সহায়ক হতে পারে, তাও সব সময়ে প্রত্যক্ষভাবে নয়। প্রকৃতি-মানুষেব যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে প্রকৃতিকে পবিবর্তিত ক'বে মানুষ নিজেকে পবিবর্তিত ক'বে চলেছে; এই নিয়েই তার জীবন। এই দ্বন্দ্বের **প্রয়োজনে** এবং এবই **প্রেরণায়** চারুকলার সৃষ্টি। সমবেব রুদ্রবসে সামবিক সঙ্গীতেব আবিষ্কার, আবার সামরিক সঙ্গীতের তালে তালে মানুষের বুকে রুদ্রবস জেগে ওঠে। প্রকৃতিব সঙ্গে দ্বন্দ্ব চালাবাব জন্যে মানুষেব অস্ত্রাগারে শিল্প একটা অস্ত্র। মহৎ শিল্পমাত্রেব—মহৎ কেন, সত্যিকাব শিল্পমাত্রেবই একটা গুণ হচ্ছে, তা ব্যক্তিকে, যে-অভিজ্ঞতাব স্তবে সে আব ব্যক্তিমাত্র নয, যেখানে সে শুধু 'মানুষ', সেই স্তবে পৌঁছিয়ে দেয, তার নিগূঢ় আদিম প্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত ক'বে। এইখানেই শিল্পেব পবমা সিদ্ধি। সাহিত্য এবং প্রগতি (রাষ্ট্রিক ও বার্তিক প্রগতি) ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে একই জীবনেব সেবক হিসাবে পরস্পরের সহায়ক হতে পারে।

চারুকলার মধ্যে প্রোপাগাণ্ডা টেনে বাস্তব জীবনে 'কাজের' সুবিধা হয় কি না, এ সম্বন্ধে তর্কের ধূম্রজাল বিস্তার না ক'রে কর্মে ও চিন্তায় যাঁবা বর্তমান যুগেব গুরু, তাঁদের দু'-একজনের মত এখানে আলোচনা করলে দ্বিতীয মতটিব সাববত্তা বোঝা যাবে। এঙ্গেলস্ বলছেন: সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাস স্থান পেতে পাবে, কিন্তু "The more the **opinions** of the author remain hidden, the better for the work

of art"—লেখকের মতামত যত প্রচ্ছন্ন থাকবে, সাহিত্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। আবার বিখ্যাত মার্ক্সীয় লেখক Ralph Fox তাঁর 'Novel and the People' গ্রন্থে সৎ-সাহিত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে লিখছেন: "What emerges is something **that no one willed'**—how exactly that sums up each great work of art"—প্রত্যেক উঁচুদরের চারুশিল্প সম্বন্ধে একটা ছোট কথা প্রযোজ্য: 'এটা কারও ইচ্ছায় সৃষ্ট হয় নি, আবির্ভূত হয়েছে।' এই উক্তিগুলো হতে এ সিদ্ধান্ত বোধহয় অবিধেয় নয় যে, রাজনৈতিক প্রগতির স্পৃহা যখন মানুষের চেতনা ছাপিয়ে তার সমগ্র চিত্তকে রসাপ্লুত করে, সেটা যখন মতামতের সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে মানবীয় অনুভূতির বিশালতায় জন্ম নেয়, জীবন্ত মানবীয় সত্য হয়ে ওঠে, সাহিত্যে তখন তার আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী; মতামতের অপরিপক্কতায় দেখা দিলে এ স্পৃহা সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণই করে, সমৃদ্ধ করে না। শিল্প স্বয়ম্ভু ব'লে তাতে বিষয়-নির্বাচনের প্রশ্নও অবাস্তব। (যমেবৈষঃ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ; বরণ-যোগ্য হবার জন্যে, অবশ্য, বিষয়ের সাধনা করা চলে।) তাছাড়া, মার্ক্স যেখানে গ্যেটের বিরুদ্ধে অন্ধ অভিযান চালানোর জন্যে তরুণ হেগেল-পন্থীদের ভর্ৎসনা করছেন: "It is possible to distinguish between Goethe, the Philistine, and Goethe, the poetic genius"—

সঙ্কীর্ণচেতা গ্যেটে হতে মহাকবি গ্যেটেকে পৃথক ক'রে দেখা সম্ভব ; বা লেনিন যেখানে টলষ্টয়ের সাহিত্যকে "mirror of the revolution"—বিপ্লবের দর্পণ—আখ্যা দিচ্ছেন ; সেখানে কি এই কথাটাই স্বীকৃত হচ্ছে না যে, ব্যাপক অনুভূতির সুন্দর অভিব্যক্তি হিসাবেই সাহিত্যেব চবম মূল্য আব সমগ্র সমাজের রূপ প্রকাশেই তাব সার্থকতা ? প্রগতি-সাহিত্যের নামে মানুষেব রসানুভূতিব ক্ষেত্রকে শুধু শ্রমিক ও কৃষকের জীবনেব মধ্যে, একটা বিশেষ বিশ্বাসেব মধ্যে, সীমিত কবাব কোনও অর্থ হয় না।

মানুষেব আদিম প্রাণশক্তিব উদ্বোধক ও আবিষ্কারক হিসাবে সমস্ত সত্যিকাব সাহিত্যই প্রগতি-সাহিত্য, তা সেটা যে-শ্রেণীব দৃষ্টিকোণ হতেই লেখা হোক না কেন। বর্তমান সমাজে শিল্পী শ্রেণী-জীব, তাব অনুভূতিও শ্রেণীভাববঞ্জিত সন্দেহ নাই ; কিন্তু "চারুকলায কি শুধু শ্রেণী-মতই ফোটে ? শ্রেণী-মতামতের রঙীন কাচেব মধ্য দিযে বাস্তবেব কোনো ছায়াপাত হয না ? শ্রেণীগত মতামত কি অন্ধতা মাত্র, শ্রেণীস্বপ্ন কি সত্য নয় ? শ্রেণীগত সীমানাব মধ্যে এখানেও কি বাস্তব জগতেব স্বীকৃতি নাই ?"—(F Levin.) লেভিন এখানে মতেব কথা বলেছেন, কিন্তু শিল্প মত প্রকাশ কবে না, করে উপলব্ধিকে। তাঁব প্রশ্নকে একটু বদলে আমবা জিজ্ঞাসা করতে পারি, শিল্পেব কি ব্যাপকতর ক্ষেত্র নাই ? শুধু শ্রেণীক্ষেত্রই আছে ?

শিল্প-দর্শনের ভূমিকা

আমাদের বক্তব্য মোটামুটি এই দাঁড়াচ্ছে :—সত্যিকার অনুভূতি ব্যতীত সাহিত্য হয় না, সুতরাং রাজনৈতিক মতামত যদি অনুভূতিতে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি সাহিত্যে প্রবেশের চেষ্টা করে, তবে অনর্থ ই ঘটে। অমন ক'রে প্রগতি-সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না। প্রগতি-সাহিত্যের কাজ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবেষ্টনে মানবচিত্তে যে বিচিত্র রস উদ্ভূত হয়, তাকে রূপায়িত করা। এরূপ পরিবেশে যে অনুভূতির উদ্ভব, সেটা ব্যষ্টিগত না হয়ে সমষ্টিগত হওয়ার দরুণ প্রগতি-সাহিত্য অব্যর্থভাবে বাস্তব-প্রধান হয়ে ওঠে। "চারুকলার চরম নীতি হচ্ছে এই যে, তা আদিম প্রকৃতির অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভেদ ক'রে তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে, তার নিয়ম ও ধারাগুলিকে আবিষ্কার করে, তদ্‌যুগীয় জনগণকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, জনগণের মধ্যে প্রকট, আদিম শক্তিগুলির উৎস উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরে।" (রোলাঁ লিখিত 'লেনিন ও টলষ্টয়' প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত।) যে বিচিত্র 'সামগ্রিক' অনুভূতি মানুষকে বিপ্লবের অভিমুখে ঠেলে নিয়ে যায়, বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে সেগুলির রূপ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রগতি-সাহিত্যকে পদে পদে বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করতে হয়; মানুষের চিন্তা, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি এ-সাহিত্যে সার্থকতা পায় বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, রূঢ় বাস্তবের, বিশেষ ক'রে, কুৎসিত অথবা করুণ বাস্তবের একটা

চিত্র ধরতে পারলেই সাহিত্য 'বাস্তব সাহিত্য' হয়ে ওঠে, হয়ত বা প্রগতি-সাহিত্যও হযে যায। এঁদো গলি, ঘেয়ো কুকুর, কাঁকড়ার খুলি প্রভৃতির সঙ্গে দুঃস্থ, দীন মানুষের বীভৎস কাতরতার ছবি আঁকলেই, সে-সাহিত্য প্রগতি-সাহিত্য হয়ে ওঠে না। সত্যিকার সাহিত্যের, প্রগতি-সাহিত্যের কাজ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য বাধা-বিপত্তি দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না, এসবের মধ্যেও সামগ্রিক (সামাজিক বা প্রাকৃতিক) মানুষের অজেয় আত্মার দুর্দম অভিযানকেও তা রূপ দেয়; জীবনের জয়যাত্রার চিত্র আঁকে। সকল মহৎ-সাহিত্যে যে-উপলব্ধি রূপায়িত, সে-উপলব্ধি 'সামগ্রিক' (collective), মানুষের নির্জ্ঞান মনের; এই জন্যেই, তার শ্রেণী-চরিত্রকে সবচেয়ে বড় কথা মনে করা ভুল। এইসব কারণেই সকল মহৎ-সাহিত্যকেই ব্যাপক অর্থে প্রগতি-সাহিত্য বলা চলে।

শিল্প ও প্রোপাগাণ্ডা

কারও কারও ধারণা, শিল্প মাত্রই শ্রেণীধর্মী এবং প্রোপাগাণ্ডা। শিল্প যে 'প্রোপাগাণ্ডা' নয়, শিল্পের বাণী যে বিশেষ একটা আগে-হতে-গড়া মত নয়, এ কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করেছি। জীবনকে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে দেখলে জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করা যায়, অন্য দৃষ্টিকোণ হতে সে-ভাবে উপলব্ধি করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, সুতরাং দৃষ্টি-কোণের পার্থক্য হেতু উপলব্ধি এবং তার রূপায়ণে পার্থক্য ঘটেই। কিন্তু এই উপলব্ধির রূপায়ণ এবং 'মত' প্রকাশ এক বস্তু নয়। 'মত' চিত্তরসে জারিত হয়ে স্বতঃ-স্ফূর্ত হলে শিল্প হতে পারে।—সরাসরি এসে 'মত' শিল্পে স্থান ক'রে নিতে পারে না।

সমস্ত শিল্পই শ্রেণীধর্মী নয়। এককালে, সুদূর অতীতের 'আদিম কম্যুনিষ্ট' সমাজে, শ্রেণী ছিল না কিন্তু শিল্প ছিল; আবার অদূর ভবিষ্যতের উন্নত কম্যুনিষ্ট সমাজে শিল্প সকল মানুষের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠবে, কিন্তু শ্রেণী লোপ পেয়ে যাবে। তাহলে, শিল্পের শ্রেণীধর্মকে মৌলিক গুণ বলা, নিঃসন্দেহে, চলে না। তবে, আদিম কম্যুনিষ্ট সমাজ ও ভবিষ্যতের বিকশিত কম্যুনিষ্ট সমাজ—এই দুই-এর

মধ্যেকার মানুষের ইতিহাসে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘটে এসেছে। এই দুই-এর মধ্যেকাব সমস্ত সভ্যতাই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে লব্ধ; উৎপাদনেব বিকাশেব পথে শ্রেণীদ্বন্দ্ব অব্যর্থ ছিল। মানুষের সমাজ যখন শ্রেণীতে বিভক্ত, মানুষেব সামাজিক উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত রূপ শিল্প তখন শ্রেণীধর্মী না হয়েই পারে না। শ্রেণীর দৃষ্টি-কোণেব বিভিন্নতা হেতু জীবনানুভূতি বিভিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পাচ্ছি, শ্রেণী-সমাজে মোটামুটি ভাবে শিল্প শ্রেণীধর্মী। তবে তা সব ক্ষেত্রে 'স্পষ্ট' থাকে না।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষণীয যে, সভ্যতার অগ্রগতিব পথে, উৎপাদন-শক্তির বিকাশে যে-শ্রেণী যখন নেতৃত্ব করেছে, শিল্পে সে-শ্রেণীর উপলব্ধি তখন প্রাধান্য পেয়েছে। এব কাবণ অবশ্য এই যে, শিল্পেব সব চেয়ে বড কাজ হ'ল, সামাজিক আত্মাকে উদ্বুদ্ধ ক'বে, 'সামাজিক জীবন'-কে সংগঠিত ক'রে,—কখনো-বা তাব জীর্ণতা ঝেড়ে দিয়ে, মানুষকে মুক্তিব পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা কবা। এই জন্যেই কোনো শ্রেণী যখন পুবাতন জীর্ণ উৎপাদন-প্রথাকে উচ্ছেদ ক'রে নূতন সামাজিক উৎপাদন-শক্তিকে মুক্তি দিয়েছে, তখন সাময়িকভাবে সেই শ্রেণীব উপলব্ধি সামাজিক জীবনের পবিপোষক হিসাবে অনেকটা সমগ্র সমাজের কল্যাণ রূপে প্রতীয়মান হযেছে। এই নূতন উৎপাদন-প্রথায় জড়তা না আসা পর্যন্ত, এই শ্রেণীব নেতৃত্ব সমাজেব অগ্রগতির পথে

বাধা ব'লে বোধ না হওয়া পর্যন্ত, এই শ্রেণীর শোষকতা জনিত সঙ্কীর্ণতা অনেকটা অলক্ষিত থাকে। বস্তুতঃ, বর্তমান যুগের পূর্ব পর্যন্ত, সমস্ত বিপ্লবী-শ্রেণী শোষক ছিল ব'লে, তার উপলব্ধি কোনোদিন পূর্ণভাবে সামাজিক বা সম্পূর্ণভাবে উদার হতে পারে নাই। আধুনিক কালের বিপ্লবী-শ্রেণী—শ্রমজীবী-শ্রেণী, এই হিসাবে, পূর্বগদের থেকে পৃথক। এ-শ্রেণীর কোনো প্রকার শোষণ-স্বার্থ না থাকায়, এর উপলব্ধির ব্যাপকতা সম্ভব। পূর্বেকার সকল শ্রেণীর শিল্প হতে এইখানে 'শ্রমজীবীশ্রেণীর শিল্প' বিশিষ্ট। এই শিল্পের মধ্যে শ্রেণী-সঙ্কীর্ণতা যা আছে তা কালক্রমে জমে যাবে না, শোষণহীনতার জন্যে অবারিত, জীবনের মুক্তস্রোতে প'ড়ে ভেসে যাবে; এ-শিল্প সর্বতোভাবে জীবনাভিমুখী।

শ্রমজীবীশ্রেণীর শিল্প—'প্রোলেটারিয়ান্' শিল্প—কথাটায় অনেকে আপত্তি করেন;—তাঁরা বলেন, ও নামে যা চলে তা শিল্পই নয়, তা 'মত-প্রচার', প্রোপাগাণ্ডা। তাঁরা ভুলে যান, বর্তমান যুগের বিপ্লবী-শ্রেণীর অনুভূতি স্থিত-স্বার্থের চির-অভ্যস্ত ভাবধারণার অনুকূল নয় ব'লে তাঁদের জড় মনে তা ঘা দেয় সত্যি, কিন্তু সে-অনুভূতি, তাই ব'লে, এতটুকু অস্বাভাবিক নয়—অসুন্দর তো নয়ই। বরং একালে এই অনুভূতিই সবচেয়ে উদার, সবচেয়ে সজীব, সবল এবং সুন্দর।

সোভিয়েটের দেশে শিল্প

দু-চারজন সোভিয়েট লেখকের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকলেও, বর্তমান রুশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন বা নন্দন-শিল্পাদির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি স্বল্প। সংবাদপত্রাদির দৌলতে সে দেশের আর্থিক ও সামরিক সমৃদ্ধির কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, কিন্তু কোনো জাতির পূর্ণ পরিচিতির জন্যে তার সংস্কৃতির খবর রাখাটাও একান্ত প্রয়োজন।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, অন্য যে-কোনো দেশের লোকের চাইতে সোভিয়েট গণতন্ত্রের অধিবাসীরা শিল্পের ও শিল্পীর মর্যাদা দেয় বেশী; তারা তা দিতে পারে। শুধু অধিবাসীরা নয়, সোভিয়েট নেতারাও যে এ বিষয়ে খুব অবহিত তার পরিচয় পাই সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টলোভী কৃষ্টিবিলাসী বুদ্ধিজীবীরা যাঁকে অভব্য ও অকৃষ্ট ব'লে আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন—সেই স্টালিনের এই একটি মাত্র উক্তি থেকে: 'লেখকরা হচ্ছেন মানবাত্মার ইঞ্জিনিয়ার'। সোভিয়েট নেতারা জানেন জীবনের মধ্যে শিল্পের স্থান কোনখানে।

সত্যিই, সোভিয়েট বিপ্লব জনসাধারণকে শুধু দাসত্ব ও বুভুক্ষা থেকেই মুক্তি দেয় নি, তার আত্মপ্রসারণের সুযোগও দিয়েছে, মানুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দিয়েছে সর্বতোভাবে।

সোভিয়েট শিল্প গড়ে উঠছে মানুষের স্বাধীন জীবনের ভিত্তিতে ; তাকে প্রতি পদে সমাজের কোনো শোষক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাব উপব নির্ভর ক'বে বা তাব মন বুঝে চলতে হয না, কাজেই শিল্প যে সেখানে সতেজ, সজীব, ও সহজে বহির্মুখী হবে, তাতে বিস্ময়েব কিছু নাই। সোভিয়েটের দেশে তাই দেখি লক্ষ লক্ষ লোক বিচিত্র সুকুমাব কলার মধ্যে দিয়ে জীবনের সহজ স্ফূর্তিকে রূপ দিয়ে চলেছে ; সোভিয়েট বিপ্লবেব আগে বিবাট রুশ সাম্রাজ্যেব যে জাতিগুলি প্রায় বন্য বর্বব জীবনযাপন কবত, যাদের অনেকের লেখবাব অক্ষবমালা পর্যন্ত ছিল না, তাবা এখন উপন্যাস লিখছে, কাব্য বচনা করছে, আধুনিক ধাবায় নাটক অভিনয় কবছে। সত্যিকাব মুক্তি মানুষকে বাতাবাতি কতখানি প্রস্ফুটিত কবতে পারে, নব্য রুশিয়াব সোভিয়েট গণতন্ত্রে আমবা তাব প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। শিল্প সেখানে ধনীব বিলাস সামগ্রী নয়, সমগ্র জাতিব গৌববেব সম্পদ।

১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে মস্কোতে যখন নিখিল সোভিয়েট লেখকদের প্রথম মহাসভা হয, তখন দেখা যায় দেশেব দূবতম প্রান্ত থেকে লোকে—সাধাবণ কিষাণ, মজুররাও চিঠি পাঠিযেছে, কেউ অভিনন্দন জানিয়ে, কেউ পরামর্শ দিয়ে, কেউ কোনো প্রশ্ন মহাসভায় আলোচনা হোক দাবী জানিয়ে। এই মহাসভায় কবিতার ধর্ম, নন্দন-বিদ্যা, বর্তমান

যুগের উপযোগী সাহিত্যের রূপ প্রভৃতি নানা কথা আলোচিত হয়েছিল। এগুলির প্রত্যেকটা ছিল তখনকাব জাতীয় শিল্প জীবনেব সাধারণ সমস্যা, আর সকল সোভিয়েটবাসীদের আলোচনাব গণ্ডীব মধ্যে। সাহিত্যালোচনা সে দেশে সাধাবণেব, তাই সতেজ ও সজীব, অধ্যাপকদেব দুর্বোধ্য ভাষাব জড়োয়া গহনাব গৌরব তাব নাই থাক।

সোভিয়েট শাসনেব প্রথম পনেরো বৎসবে রুশিয়ায পুস্তক প্রকাশিত হযেছিল প্রায পঞ্চাশ হাজাব কোটি; এব তুলনায দেখি, জাব আমলেব শেষ ত্রিশ বৎসবেব বিশ হাজাব কোটি। রুশিযায প্রতি বৎসব প্রকাশিত পুস্তকেব সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাব পব দেখা গেল, এক রুশিযায় যত বই বেরিযেছে, জার্মাণী, ফ্রান্স আর ইংলণ্ড, এই তিনে মিলিয়ে তত বই বেরোযনি। সব চেয়ে বিস্ময়কব হচ্ছে, সোভিয়েটেব অন্তর্গত ছোট ছোট জাতিদেব নিজ ভাষায বইগুলি। ১৯২৯ সাল থেকে উক্রেনিয়ান ভাষার প্রতি বৎসব যত বই বাব হচ্ছে, বিপ্লবেব আগে একশ বৎসবেও মোট তত বই প্রকাশ হয নি। এক মস্কোব আন্তর্জাতিক পুস্তাকাগাব থেকে পঁচাশীটি ভাষায বই প্রকাশিত হয়—স্কুল কলেজেব পাঠ্য, নাটক, নভেল, কবিতা, গল্প কাহিনী প্রভৃতি সর্ব প্রকাবের বই।

সোভিয়েটেব লোকে নিজেদিকে সর্বকালেব উত্তরাধিকারী

ব'লে মনে করে। তারা নানা দেশের নানা যুগের কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীর জয়ন্তী অনুষ্ঠান করে। তাঁদের দানের মহত্ব তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে। পারসিক কবি ফিরদৌসী, ইংরাজ সেক্সপীয়র বা ডারউইন, জার্মাণ গ্যেটে প্রভৃতি সকলকেই তারা মানবজাতির—সুতরাং সোভিয়েটবাসীদেরও গৌরব ব'লে জানে। দেশব্যাপী সভা সমিতি ক'রে সাময়িক পত্রাদিতে এদের সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা ক'রে তারা এঁদের সম্মান করে। (গত বৎসর ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পীসিজ' বইটির অশীতি বাৎসরিক জয়ন্তী হয়ে গেল।) দুনিয়ার সকল দেশের ভাল ভাল লেখকদের বই সে-দেশে হাজারে হাজারে বিক্রী হয়। ল্যারমনটভ, নেকরাসভ, কোরোলেঙ্কো, গোগোল, টুর্গেনেভ, চেহভ প্রভৃতি রুশিযার সেকালের বড় লেখকদের বইগুলির তো সত্তর-আশি হাজারের এক-একটা সংস্করণ বার হয। কবিদের মধ্যে পুস্কিনের লেখার বছরে তিন-চারটি সংস্করণ বেরোয। আগেকার লেখকদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছেন টলষ্টয়। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে টলষ্টয়ের বই বিক্রী হযেছে প্রায় এক কোটি পনেরো লক্ষখানা।

এ থেকে কেউ যেন না ধরে নেন যে, সোভিযেটবাসীরা পুরানো লেখকদের লেখাই শুধু পড়ে। কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্যে যে, এ দেশে এখনও অনেকের ধারণা যে, রুশিয়া চলেছে অতীতের সব কিছু অস্বীকার

ক'রে। কিন্তু তার অর্থ তো, আদিম বর্ববতায ফিরে যাওয়া।

আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের সব চেয়ে জনপ্রিয বই হচ্ছে শলোকভের 'শান্ত ডন্' ও 'পতিত জমির চাষ'। সোভিয়েট সমাজেব বাধা, দ্বন্দ্ব ও বিজযের একটা বিবাট চিত্র এই দুইটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এ থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েট পাঠকদেব সাধাবণ রুচি। তারা উপন্যাস নাটকে, ভাবাক্রান্ত আত্মার জটিল বিশ্লেষণ চায় না; ও বস্তুর চাহিদা ও জোগান হয়, জাতীয জীবনে সহজ বিকাশেব সর্ব পথ রুদ্ধ মনে হওযায় মানুষ যখন অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হযে ওঠে তখন। সোভিযেট দেশে জনসাধাবণেব সমগ্র জীবনধাবা বহির্মুখী, তাদের ভাল লাগে তারা যা গডে তুলছে, সমাজে যে সব নূতনতর সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'বে চলছে, সে সবেব কথা। তাদের কৌতূহল, 'হওয়া'র চেযে 'কবা'ব সম্বন্ধে বেশী। বিপ্লবের পরে, প্রথম দিকটায় সোভিযেট উপন্যাস বা নাটকেব নায়ক নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে বিজযেব মুখে মাবা যেত; সমবেত মানবেব জয়যাত্রা, সমবেত সাধনা অক্ষুণ্ণ চলত। এখন কিন্তু নায়ক মবে না, বাধা পেযে তা জয করে, নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নিজেকে কেবলই সৃষ্টি ক'রে চলে, অন্তর্বীক্ষণের সহায়তায় নয, কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে। সোভিয়েট সাহিত্যের নায়ক এখন আশাবাদী ভবিষ্যৎ-স্রষ্টা।

শিল্প-দর্শনের ভূমিকা

শুধু সাহিত্যের নয়, সোভিয়েট কলামাত্রেবই মূল সুব এখন এইরূপ। শিল্পে সামাজিক জীবনেব স্ফূর্তি ফুটে ওঠে বইতো নয়।

সকল সুকুমাব কলাতেই সোভিয়েট জনসাধাবণেব সমান অনুরক্তি। থিয়েটাবে ভীড লেগেই থাকে, চিত্রভবনে স্থানাভাবেব জন্যে লোককে সার বেঁধে প্রতীক্ষা কবতে হয়। থিয়েটাব বা শিল্পসদনে গিযে লোকে—সাধাবণ মজুববাও—মুখ বুজে আনাড়ীর মত দাঁডিযে থাকে না, তাদেব অভিমত নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কবে। একটা নূতন সভ্যতা সৃষ্টি কবছে যাবা, হোক না শিল্প, যে-কোনো সৃষ্টিকাজেব বিচাব কববাব তাদেব অধিকাব আছে। তা ছাডা তাবাও তো মেজাজ মাফিক মাঝে মাঝে বচনা ক'বে থাকে—সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, নাট্যাভিনয়।

গত কযেক বৎসবেব মধ্যে বাশিযার সর্বত্র নানা শিল্পচর্চাব অসংখ্য চক্র গডে উঠেছে। এক নাট্য-চক্রগুলিব সদস্য সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ছিল প্রায় বাবো লক্ষ, এখন অনেক বৃদ্ধি পেযেছে। গান, নাচ, চিত্রাঙ্কন, অভিনয প্রভৃতিব চর্চা চক্রেব মধ্যে দিযে সোভিয়েট জীবনেব স্ফূর্তি উচ্ছ্বসিত ধাবায বয়ে চলেছে। বেশী ভাগ লোকের কিন্তু ঝোঁক দেখা যায় সংবাদ লেখার দিকে। গ্রামে প্রাচীবপত্রেব মাবফৎ তাবা স্থানীয অভাব অভিযোগেব দিকে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জরুরী

সংবাদ থাকলে মস্কোব প্রাভ্দা বা ইজভেস্তিযায় প্রকাশেব জন্যে পাঠায। এক মস্কোর কিষাণ-সমাচাবপত্রে বৎসবে প্রায বিশ লক্ষ চিঠি আসে। অধিকাংশই ছাপা হয় না, কিন্তু উত্তর সব চিঠিবই দেওয়া হয। তাবপব অছাপা চিঠিগুলি বাছাই ক'বে উপন্যাস বা ইতিহাসেব উপাদান হিসাবে ব্যবহাব কবৃবাব জন্যে বা বাষ্ট্রেব আইন প্রণয়নে সহায়তাব জন্যে রেখে দেওয়া হয। খনি, কাবখানা প্রভৃতিবও নিজেব নিজের খবরের কাগজ আছে। সমগ্র সোভিয়েট গণতন্ত্রে এই কাবখানা পত্রগুলিব সংখ্যা প্রায চার হাজাব। এগুলিব কতক দৈনিক কতক সাপ্তাহিক; আর কাট্‌তি দু'তিন শ থেকে (বড কাবখানাব পত্র হলে) বিশ হাজাব পর্যন্ত। এই সমস্ত কৃষিকেন্দ্র ও কাবখানার পত্রে অনেক নূতন লেখকেব লেখাব হাতেখড়ি হযেছে, দেখতে দেখতে দেশেব সুদূব প্রান্তে সাহিত্য সভা গড়ে উঠেছে। খেত-মজুব, কলেব মজুর, খনিব মজুববাও তাদেব সাধাবণ কাজেব ফাঁকে ফাঁকে সুসাহিত্য বচনার সুযোগ পেযেছে।

ইতিপূর্বে সোভিযেট-লেখক-মহাসভাব উল্লেখ কবা হযেছে। শুধু সাহিত্যেব নয়, সেখানে প্রায়ই গানের, কাহিনী বলাব, নাচের—সব কিছুর জাতীয় মহাবাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাব সম্মেলন হয়; গুণীদেব সম্মানের পদবী পর্যন্ত দেওয়া হয়। এই সব অলিম্পিয়াড ছাড়া খিরগিজ, তাদ্‌জিক, উজবেক,

বুরিয়াৎ-মঙ্গল প্রভৃতি সেদিন-পর্যন্ত-বুনো জাতিদেব মধ্যেও মাঝে মাঝে সংস্কৃতিব অভিযান চলেছে। তাই-না আজ খিবগিজ কন্সার্টের খ্যাতি শুনি, শুনি তাজিকদের দেশে সুন্দব চলচ্চিত্র হচ্ছে, তাতাববা অপেবা থিয়েটার খুলছে। লক্ষ লক্ষ জীবনেব বসব্যাকুলতা থেকে রুশিযার পেশাদাব শিল্পীবা তাঁদেব সজীবতা সংগ্রহ কবেন। এই জন্যে জনসাধারণেব জীবন-প্রবাহেব নিগূঢ় সংস্পর্শে তাঁদেব থাকতে হয়, জনসাধাবণেব ভাব ও কর্মধাবাব সংবাদ বাখতে হয। জনপ্রিয় হতে হলে, এই জন্যেই সোভিয়েট লেখকদের প্রযোজন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠাব ছন্দটিকে ঠিকমত আযত্ত কবা, সমাজের সম্বন্ধ-বন্ধনগুলি সম্যক উপলব্ধি কবা ও পাঠকদের করানো। সোভিযেট গণতন্ত্রের এখনকাব প্রধান লেখক শোলোকভ্ এই জন্যেই তাঁর স্থাযী বাসা রেখেছেন এক গ্রামে। সেই গ্রামটিব বিবর্তমান জীবনকে ঘিরে তাঁব উপন্যাসের পর উপন্যাস রচিত হচ্ছে।

ওদেশে শিল্পী আর শিল্পরসিকেব মধ্যে স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। এ ঘনিষ্ঠতা সক্রিয়। হ্বাখ্‌টান্‌গভ থিয়েটারে এক একটা দৃশ্যের পর শ্রোতাদের তা নিযে আলেচনা করবাব সুযোগ দেওয়া হয, অভিনয়ান্তে নটবাও এ আলোচনায় যোগ দেন। পাঠকদেব সঙ্গে লেখকদের আলাপ-আলোচনা তো সোভিয়েট কারখানা জীবনের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে। শোলোকভ, ট্রেটিয়াকভ প্রভৃতি গ্রন্থকাববা প্রায়ই

মজুব ও কিষাণদের সভায় তাঁদেব আধলেখা বই প'ড়ে শোনান।

জনগণের কাছ থেকে এই সাড়া পাওয়া শিল্পীমনের যে কত বড় খোরাক, শিল্পীমাত্রেই তা জানেন। তা ছাড়া, শিল্পীরা ওদেশে সঙ্ঘবদ্ধ , লেখক, অভিনেতা, চিত্রকর সব রকম শিল্পীদের স্বতন্ত্র সংগঠন আছে। গত বৎসর জুন মাসে চিত্রকর ও ভাস্কবদের এক বিরাট নিখিল রুশীয় সংগঠন হযেছে। এই সব সঙ্ঘ হতে শিল্পীরা তাঁদের কাজে সব বকম সুবিধা ও সাহায্য পান। সোভিয়েট শিল্পীকে জীবনেব সঙ্গে একক দ্বন্দ্ব করতে হয় না ; সম্পন্ন ও প্রভাবশালী সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে সোভিযেট-শিল্পী সবকাবী পবিকল্পনা-বিভাগগুলিব সঙ্গে সম্পৃক্ত, দেশেব সংগঠিত জীবনের অঙ্গীভূত।

এ সব ছাড়া, সোভিযেট জীবনেব এক বিশিষ্ট দান, সমবেতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি। অনেকে মিলে, কখন-বা কারখানা শুদ্ধ লোক মিলে সাহিত্য রচনা হ'ল সোভিয়েট শিল্প-জীবনের অপূর্ব কীর্তি। বাল্টিক-শ্বেতসাগর খাল কাটাব ইতিকথা 'ডেলোমর' রচনা হ'ল ত্রিশজন পেশাদার লেখকের সমবেত সাধনায়। উরল প্রদেশের একটা খনির জীবনকথা রূপ পেল সেখানকার শতাধিক শ্রমিকেব মিলিত প্রেরণায়—'উঁচু পাহাড়েব ঘটনাবলী' নামক পুস্তকে।

এ কথা স্বীকার্য যে, সোভিয়েট শিল্প এখনও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর

খুব বেশী কিছু দিতে পারে নি। তবু যা দিয়েছে তাও তো কম নয়। স্থাপত্যে মস্কোর ভূনিম্নস্থ পথ ও সোভিয়েট প্রাসাদ, সাহিত্যে শোলোকভ ও অষ্ট্রভস্কিব বইগুলি নাটক ও চলচ্চিত্রে 'পোটেমকিন' চ্যাপাবিয়েভ' 'ম্যাক্সিমেব যৌবন'—এ সবের তুলনা কোথায় ?

সোভিয়েট শিল্পীদিকে নাকি 'সবকারেব' মন বুঝে চলতে হয় ? যাঁবা এ প্রশ্ন তোলেন তাঁবা ভুলে যান সোভিয়েট শাসন সত্যিসত্যিই জনসাধারণের শাসন, তাঁবা ভুলে যান যে, সোভিয়েট সরকাবেব 'রাজনৈতিক সম্পাদক' অর্থাৎ সেন্সবেব মতটাই চবম মত নয, প্রয়োজনমত তিনি সোভিযেট সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদেব পরামর্শ নিয়ে চলেন। তা ছাড়া ধনিকতন্ত্র সমাজে ধনীদের খেযাল, পুস্তক প্রকাশকদের ঐকান্তিক 'লাভ'-নিষ্ঠা সত্ত্বেও যখন শিল্প বেঁচে এসেছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে কী প্রয়োজন যাঁরা জানেন, এমন সব বিশিষ্ট সমালোচকদেব বিচাবাধীন হলে শিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনায় আঁৎকে ওঠার বড একটা কাবণ থাকে কি ?

শিল্প যেখানে সকলের অধিগম্য, শিল্পেব পূর্ণতর বিকাশ সেখানে অব্যর্থ।